৫ মার্চ ১৯৮৬ ❑ আনন্দবাজার প্রকাশন ❑ তিন টাকা

আনন্দমেলা

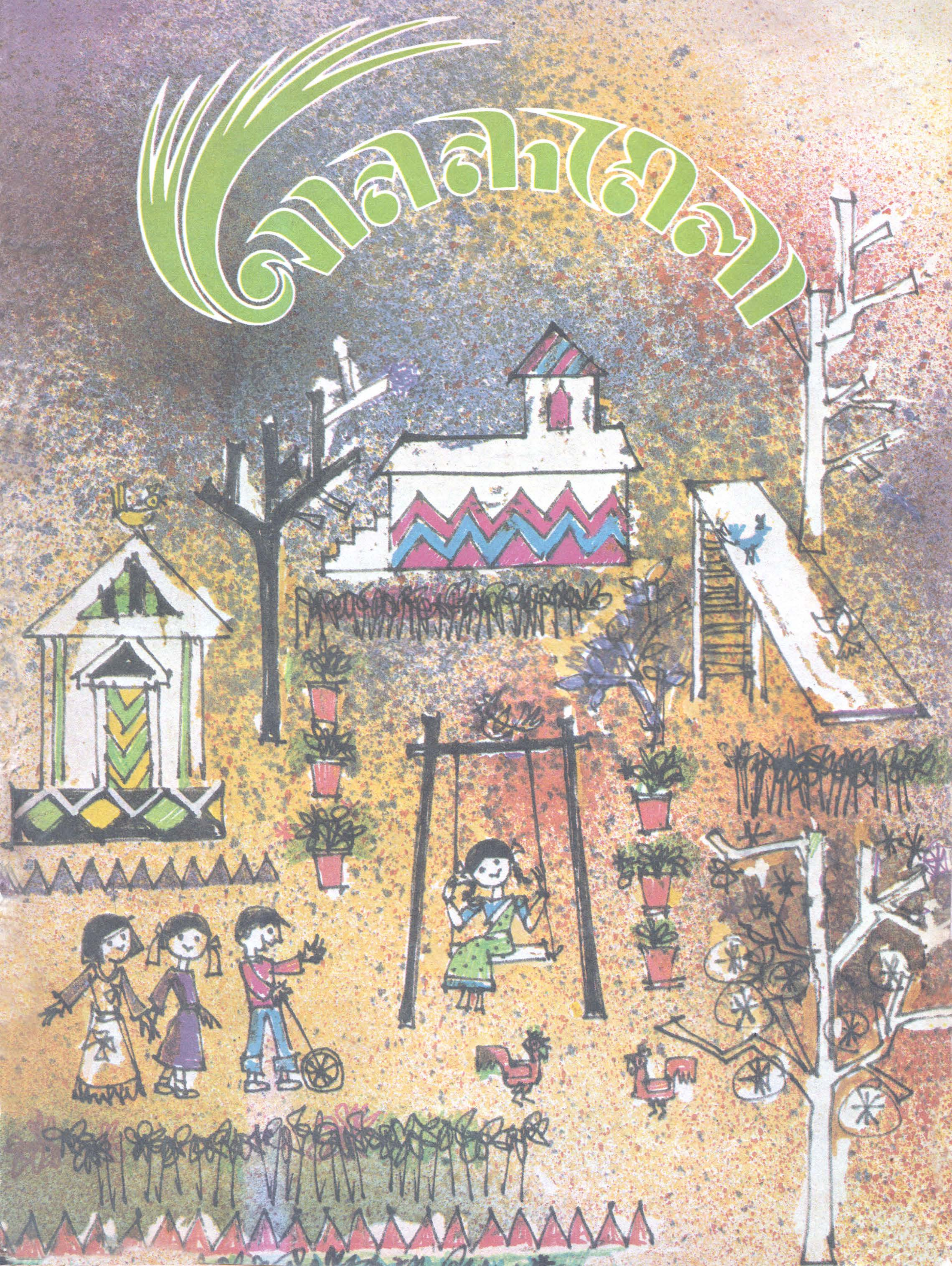

দেবজ্যোতি
ধু লো খে লা
অতীতের সাগর সেঁচে মনি মানিক্যের সন্ধান
Please visit : http://dhulokhela.blogspot.in/
পড়ুন ও আমাদের
সংরক্ষনে সাহায্য করুন

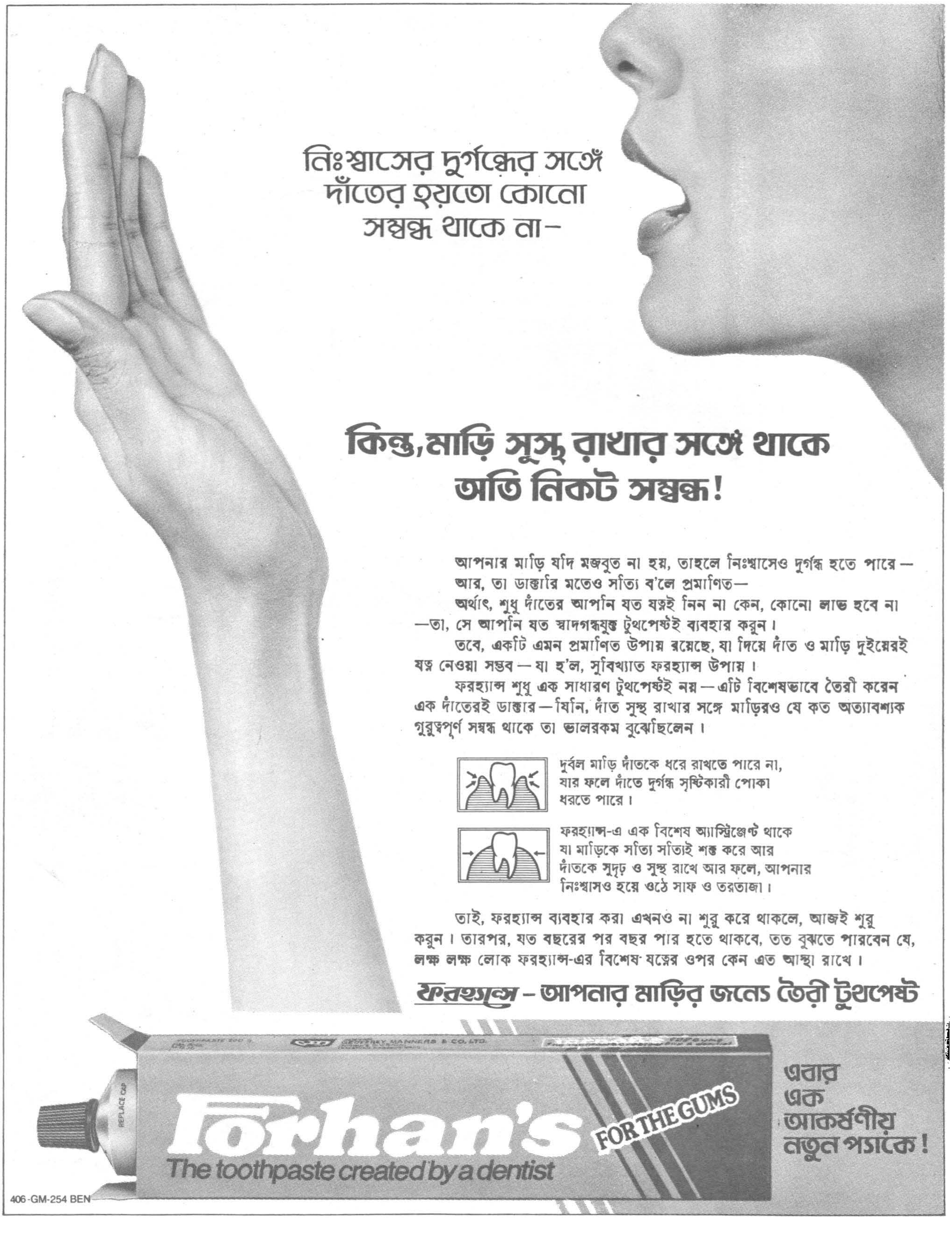
নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধের সঙ্গে
দাঁতের হয়তো কোনো
সম্বন্ধ থাকে না—
কিন্তু, মাড়ি সুস্থ রাখার সঙ্গে থাকে
অতি নিকট সম্বন্ধ!
আপনার মাড়ি যদি মজবুত না হয়, তাহলে নিঃশ্বাসেও দুর্গন্ধ হতে পারে— আর, তা ডাক্তারি মতেও সত্যি ব'লে প্রমাণিত—
অর্থাৎ, শুধু দাঁতের আপনি যত যত্নই নিন না কেন, কোনো লাভ হবে না —তা, সে আপনি যত স্বাদগন্ধযুক্ত টুথপেস্টই ব্যবহার করুন।
তবে, একটি এমন প্রমাণিত উপায় রয়েছে, যা দিয়ে দাঁত ও মাড়ি দুইয়েরই যত্ন নেওয়া সম্ভব — যা হ'ল, সুবিখ্যাত ফরহ্যান্স উপায়।
ফরহ্যান্স শুধু এক সাধারণ টুথপেস্টই নয়—এটি বিশেষভাবে তৈরী করেন এক দাঁতেরই ডাক্তার—যিনি, দাঁত সুস্থ রাখার সঙ্গে মাড়িরও যে কত অত্যাবশ্যক গুরুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ থাকে তা ভালরকম বুঝেছিলেন।
দুর্বল মাড়ি দাঁতকে ধরে রাখতে পারে না, যার ফলে দাঁতে দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী পোকা ধরতে পারে।
ফরহ্যান্স-এ এক বিশেষ অ্যাস্ট্রিঞ্জেণ্ট থাকে যা মাড়িকে সত্যি সত্যিই শক্ত করে আর দাঁতকে সুদৃঢ় ও সুস্থ রাখে আর ফলে, আপনার নিঃশ্বাসও হয়ে ওঠে সাফ ও তরতাজা।
তাই, ফরহ্যান্স ব্যবহার করা এখনও না শুরু করে থাকলে, আজই শুরু করুন। তারপর, যত বছরের পর বছর পার হতে থাকবে, তত বুঝতে পারবেন যে, লক্ষ লক্ষ লোক ফরহ্যান্স-এর বিশেষ যত্নের ওপর কেন এত আস্থা রাখে।
ফরহ্যান্স – আপনার মাড়ির জন্যে তৈরী টুথপেস্ট
Forhan's
FOR THE GUMS
The toothpaste created by a dentist
REPLACE CAP
এবার
এক
আকর্ষণীয়
নতুন প্যাকে!
406-GM-254 BEN

আনন্দমেলা

২১ ফাল্গুন ১৩৯২ □ ৫ মার্চ ১৯৮৬ □ ১১ বর্ষ ২৪ সংখ্যা

সম্পূর্ণ উপন্যাস

অনুসন্ধানীর রহস্যভেদ। অজেয় রায় ৩৫

গল্প

ভূতের বাগান। পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৯
ফ্ল্যাটবাড়িতে ইঁদুর। প্রদীপচন্দ্র বসু ১৩
দাদুভাই। পরেশ দে ২৪
বিভ্রাট। গোপাল লাহিড়ী ২৭
পাঁচ-দশকে পঞ্চাশ। মুস্তাফা নাশাদ ২৯
ভগবানের খোঁজে। মিহির ভট্টাচার্য ৫১

কবিতা ও ছড়া

নহুষ রাজার জন্মান্তর। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ৮
ইনটিরিয়ার ডেকোরেশন। রূপশ্রী দত্ত ৮
ফাল্গুনে চত্তিরে। রত্নেশ্বর হাজরা ১১

বিজ্ঞানবিচিত্রা

নবযুগের নায়ক। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৫
জেনে নাও। অরূপরতন ভট্টাচার্য ১৮
প্রযুক্তির বিচিত্র খবর। সুজিতকুমার নাহা ১৯

ধারাবাহিক উপন্যাস

শয়তানের চোখ। সমরেশ মজুমদার ১৬
গোলমাল। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৩২

শার্লক হোমসের গল্প

সিলভার ব্লেজ। সার আর্থার কোনান ডয়েল ৫৫

লেখাপড়া

প্রদোষ…পরাহ্ন…(অর্থ জানো)। দেব-সেনাপতি ৭
বেড়ানোর ছবি (সহজে ইংরেজি)। প্রসাদ ৭

খেলাধুলো

বেনসন অ্যাণ্ড হেজেস কাপ মরীচিকা হয়ে রইল। সম্রাট রায় ৬২
ক্রমেই ডুবছে বাংলার ক্রিকেট। রাজা গুপ্ত ৬৩
জেড্ডায় হেরে গেল ইস্টবেঙ্গল। নৃপতি চৌধুরী ৬৫
নেহরু-কাপ রাশিয়া পেল। অশোক রায় ৬৬

চিত্রকাহিনী ও কমিক্স

টিনটিন ২০, রোভার্সের রয় ২২, টারজান ৩১
সদাশিব ৪৯, গাবলু ৬১

অন্যান্য আকর্ষণ

ডাক্তারবাবু বলছেন। (ডাঃ) বিশ্বনাথ রায় ৫৪
তোমাদের পাতা ৫০, ধাঁধা ৫৮, শব্দসন্ধান ৫৮
মজার খেলা ৫৯, হাসিখুশি ৫৯

প্রচ্ছদ : কৃষ্ণেন্দু চাকী

সম্পাদক : **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী**

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দাম তিন টাকা। বিমান মাশুল ত্রিপুরা ১০ পয়সা : উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

খুচরা বিক্রেতাবন্ধুদের জন্য সুখবর

কোহিনূর সামার স্পেশাল '৮৬

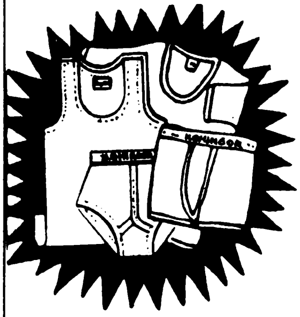

★ চার্লি ইন্টারলক ড্রয়ার ও ব্রিফ
★ সামার কুল রঙিন গেঞ্জি
★ লেডিজ প্যান্টি
বিক্রির ওপর

বিনামূল্যে উপহার

আপনাদের যা করতে হবে :

ওপরের রকমারি জিনিসগুলি কেনার সময় আপনার ডিলারের কাছ থেকে অর্ধেক বা পুরা কুপন সংগ্রহ করুন এবং নিম্নোক্তমতো চমৎকার উপহার সংগ্রহ করুন :

১) এক ডজন ড্রয়ার কালার রিব (যেকোন সাইজ)
এক ডজন মেট্রো কালার এফ আর এন (সাইজ ৩০×৩৪)
৬০টি পুরা বা ১২০টি অর্ধেক কুপনে বিনামূল্যে

২) ১½ ডজন মেট্রো কালার এফ আর এন (সাইজ ৩০×৩৪)
" " " বি এল এফ আর এন (")
" " নিউ মেট্রো এফ আর এন (")
" " ৬৬৬ বি এল আর এন (")
১২০টি পুরা বা ২৪০টি অর্ধেক কুপনে বিনামূল্যে

৩ ডজন মেট্রো কালার এফ আর এন (সাইজ ৩০×৩৪)
৩ ডজন মেট্রো বি এল এফ আর এন (সাইজ ৩০×৩৪)
১½ ডজন নিউ মেট্রো এফ আর এন (সাইজ ৩০×৩৪)
১½ ডজন ওয়াই ফ্রন্ট বি এল (যেকোন সাইজ)
১½ ডজন শ্রীমান এম ই আর সি ডি এল আর এন (সাইজ ৩০×৩৪)
১৮০টি পুরা বা ৩৬০টি অর্ধেক কুপনে বিনামূল্যে

মনে রাখবেন শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল, ১৯৮৬

এ সুযোগ হারাবেন না

আমাদের খুচরা বিক্রেতাবন্ধুবর্গকে অনুরোধ মালপত্র বিলম্বে সরবরাহের জন্য বা অন্য কোন কারণে অসুবিধার মুখোমুখি হলে সরাসরি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন :

কোহিনুর নিটিং মিলস্
১১৩ মনোহর দাস কাটরা, কলিকাতা-৭০০০০৭
ফোন : ৩৩৩৩১২—৩৩০৪৩৪

সুমীত ব্যবহারে বহুবিধ সুবিধে

এই মেশিনের সব কাজ তার প্রাণকেন্দ্র থেকে উদ্ভাবিত

এর হেভী ডিউটি মোটর না থেমে ৩০ মিনিট চলতে পারে।
বিশেষ ডিজাইনে তৈরী চারটি ব্লেড ও অল্প পরিমাণ পেষাই করার ক্যাপযুক্ত
এই সুমীত ডোমেস্টিক কিচেন মেশিন কত সহজে রান্নার
মূল সরঞ্জাম বানিয়ে দেয়।

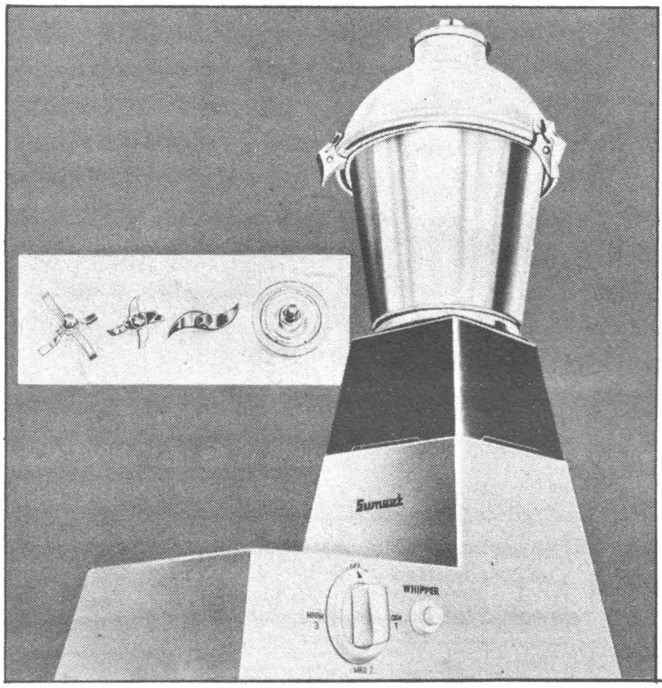

লঙ্কা আর গরম মশলা
২ মিনিটে শুকনো পেষাই।

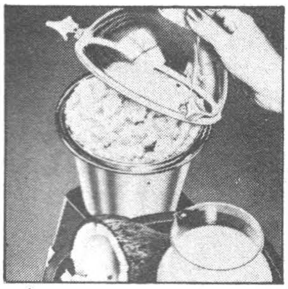

কড়াই ডাল, চাল ও নারকোলের
শাঁস ২ মিনিটে ভিজে পেষাই।

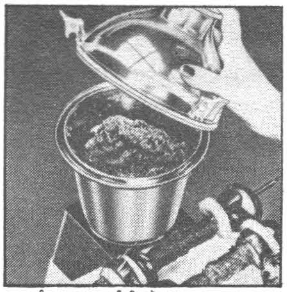

মাংস কিমা করে ১ মিনিটে আর
গাজর, পেঁয়াজ, নারকোল ও বাদাম
কুরে দেয়...কয়েক সেকেণ্ডে।

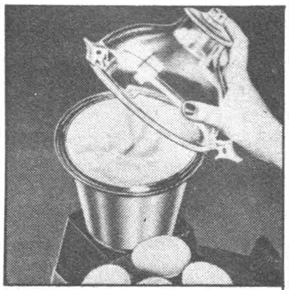

লস্যি, দুধ আর ডিমের সাদা
অংশ ফেটায় ১ মিনিটে।

এখন যোগ হ'ল সুমীত ফুড প্রসেসর অ্যাটাচমেণ্ট

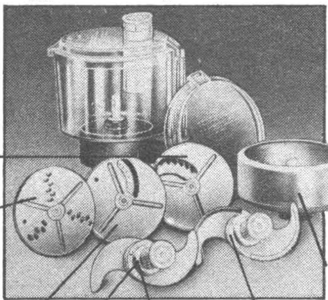

সুমীত আপনাকে দিচ্ছে আর একটা বিশেষ সুবিধে—নতুন ঐচ্ছিক ফুড প্রসেসর অ্যাটাচমেণ্ট লাগিয়ে আপনি অনেক কিছুই করতে পারবেন! এতে আছে স্বচ্ছ অথচ ভাঙ্গে না এমন একটি ৩.৮৮ লিটারের পাত্র, ৫টি বদলযোগ্য ব্লেড ও ডিস্ক আর রস করবার যন্ত্র। এই অ্যাটাচমেণ্টটি আপনি আপনার সুমীত ডোমেস্টিক বেসিক ইউনিটে লাগিয়ে দিন, ব্যস্, আর দেখুন কী বিস্ময় সৃষ্টি করে!

সুমীত®

৪০০ ওয়াট ২২০-২৪০ ভোল্ট~ ৩০ মিনিট রেটিং

শক্তপোক্ত রান্নার ঝক্কি সামলাতে শক্তপোক্ত ভাবে তৈরী।

আমাদের বিনামূল্যে প্রদর্শনী দেখার অপেক্ষায় থাকুন আর সুমীত আপনার কি কি কাজ কি ভাবে করছে—চাক্ষুস দেখুন।

সার্ভিস সেণ্টার ঃ

কলকাতা ঃ কে দত্তপানি অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রা. লি, ৫৫, এজরা স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০১ ফোন ঃ ২৬৬৭২৮/২৯। সুমীত সার্ভিস সেণ্টার (দক্ষিণ) পি-৪৯৮ কেয়াতলা রোড, দু'তলা, কলকাতা-৭০০ ০২৯ ফোন ঃ ৪৬৬১১৬। **গৌহাটী ঃ** এইচ. ডি. ট্রেডার্স, ডুগার বিল্ডিং, ফ্যান্সী বাজার, গৌহাটি, আসাম-৭৮১০০১ ফোন ঃ ২৮০২৮

OBM/3187 BEN

নবযুগের নায়ক

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

দুনিয়ার আর-সব দেশে গোড়াকার দ্বিগর্ভ স্তন্যপায়ীদের সরিয়ে কিছুদিন পরেই তাদের যোগ্যতর জাতভাইরা এসে জীবনের হাল ধরল। এই নবাগত স্তন্যপায়ীরা ভাগ হয়ে গেল ন'টি শাখায়। পাঁচটি ঠাঁই নিল ডাঙায়, দুটি সমুদ্রে, একটি গাছে আর একটি আকাশে। এর মধ্যে কে হবে নবযুগের নায়ক? কার আছে সেই যোগ্যতা?

খড়্গের মতন দাঁতঅলা বাঘ তখন জঙ্গলে জঙ্গলে ছোট-বড় জানোয়ার মেরে বেড়াচ্ছে; ছোট হরিণ থেকে শুরু করে কৃষ্ণকায় প্রকাণ্ড ভাল্লুক পর্যন্ত এই খড়্গদন্তী বাঘের শিকার হচ্ছে। অন্যদিকে বুনো কুকুর আর বেড়ালের যম হল ভাল্লুক। কাজেই বড়বড় ক্ষুধার্ত হিংস্র জন্তুর হাত এড়িয়ে শুধু তারাই বেঁচে থাকার উপায় করতে পারল, যারা চোখেকানে হুঁশিয়ার আর জোরে ছুটতে পারে।

একদল প্রাণীর আবার বাঁচার পক্ষে এ ছাড়াও কিছুটা বাড়তি সুবিধে ছিল। তারা থাকত গাছে; বিপদ টের পেলেই তারা গাছের ডাল বেয়ে শত্রুর নাগালের বাইরে চলে যেতে পারত। এদের বলা হয় প্রাইমেট বা পরমপ্রাণী।

এদের পূর্বপুরুষদের ক্রমবিকাশ শুরু হয় ছ'কোটি বছর আগে। লম্বাটে শরীর, খুদে খুদে পা, অনেকটা ইঁদুর-ইঁদুর দেখতে। তাদের বংশে যে প্রাইমেটরা জন্মাল, তাদেরও দেখতে ছিল ছোট-ছোট গেছো ইঁদুরেরই মতো। পরে তাদের একদল ভোল বদলায়। গাছে বাস করার পক্ষে ক্রমেই তারা পোক্ত হয়ে উঠল। সেদিনের সেই আদি প্রাইমেটেরই উত্তরপুরুষ হল লেমুর, বানর আর এপ্ বা নরবানর—আর, একেবারে শেষে, মানুষ।

তার মানে, একদিন শাখামৃগ ছিল আমারই পূর্বপুরুষ? আর পাঁচ কোটি বছর তারা কেবল গাছে-গাছেই কাটিয়েছে?

গাছে থাকার সময় তাদের দেহে কী পরিবর্তন এসেছিল দেখা যাক:

ঠ্যাং: সামনের আর পেছনের—একেক জোড়া ঠ্যাং ক্রমে একেক রকমের কাজে লাগল। প্রধানত পেছনের দুটোতে শরীরের ভর পড়ল। সামনের দুটো দিয়ে চলল কোনও কিছু নাড়ানো-চাড়ানো, ধরাছোঁয়া আর পরখ করার কাজ। সামনের ঠ্যাং দুটো ক্রমেই দুটো হাতের মতো হয়ে উঠল।

হাতের পাঞ্জা, পায়ের পাতা: আদি প্রাইমেটদের হাতের পাঞ্জা আর পায়ের পাতা ডাল ধরার কাজে লাগত। এমনি করে টান পড়ে একেক হাতেপায়ে হল চারটি করে লম্বা আর একটি করে বুড়ো আঙুল। বুড়ো আঙুলটা এমন যে, অন্য আঙুলের দিকে হেলানো যায়।

চোখ: গাছে থাকতে গেলে খুব চোখা হতে হয়। যেসব প্রাইমেটের চোখ বড় এবং দু'চোখ দিয়ে একসঙ্গে একটা জিনিস দেখতে পারে—যোগ্যতায় তারাই হল সেরা। কুকুর কি খরগোশ, অধিকাংশ জিনিসই দেখে একচোখ দিয়ে। দু'চোখ দিয়ে দেখলে দুটো আলাদা জিনিসে তাদের নজর পড়ে। এক ডাল ছেড়ে লাফিয়ে অন্য ডাল ধরতে গেলে দু'চোখের চাই নিখুঁত দূরত্বের হিসেব। কেননা ফস্‌কালেই প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

নাকমুখ: তাই বলে সব কি আর হয়? প্রাইমেটদের চোখের নজর বাড়ল বটে, কিন্তু ঘ্রাণশক্তি কমে এল। শোঁকার চেয়ে দেখার ওপর জোর পড়ায়, শুঁড়-ধরনের লম্বা নাকেরও আর দরকার রইল না। খাবারে মুখ লাগিয়ে খাওয়ার বদলে, হাত দিয়ে খাবার মুখে তোলার ব্যবস্থা হওয়ায় প্রাইমেটদের

প্রাইমেটদেরই একটি শাখার বংশধর এই লেমুর

চোয়াল ছোট হয়ে এল। মুখ রইল শুধু চিবিয়ে খাওয়ার জন্যে। এইভাবে প্রাইমেটের মুখে মানুষের আদল এল।

মাথা: শেষ অব্দি প্রাইমেটদের মগজ আরও বড় এবং মাথার খুলি আরও গোল হল।

এসব বদল হতে কম সময় লাগেনি। আর পৃথিবীও থেকে-থেকে পালটেছে।

জঙ্গল লোপ পাওয়ায় খড়্গদন্তী বাঘেরাও আর রইল না। পুরনো অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণীকে হটিয়ে দিয়ে তাদের জায়গা জুড়ে বসল অনেক নতুন ধরনের জীব। যেমন, সাইবেরিয়ার সমতলে ঘুরে-বেড়ানো লোমওয়ালা ম্যামথ।

প্রিয় লেখক, প্রিয় বই

বিমল কর কয়েকটি দুর্ধর্ষ বই লিখেছেন ছোটদের জন্য। কোনোটি তুমুল হাসির, কোনোটি জমজমাট রহস্য-রোমাঞ্চ, কোনোটি আবার কল্পবিজ্ঞান-কাহিনী। যেমন, 'ওআণ্ডারমামা'। জাপান-ফেরৎ এক আজব মামার আজগবি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার এ এক প্রচণ্ড হুল্লোড়ময় কাহিনী। আবার, 'কাপালিকরা এখনও আছে'তে এ-যুগের এক কাপালিকের গা-ছমছম কাণ্ডকারখানার রহস্য কীভাবে ধরে ফেলল দুই কিশোর ও তাদের ম্যাজিশিয়ান বন্ধু কিকিরা, তারই দুর্দান্ত বিবরণ। এই তিন মূর্তিরই আরেক রহস্য-ভেদের তুখোড় কাহিনী 'রাজবাড়ির ছোরা'। এ-বইয়ের সঙ্গেই আবার, এক-মলাটের মধ্যে, অসাধারণ এক কল্পবিজ্ঞান কাহিনী—'হারানো জীপের রহস্য'। সম্পূর্ণ নতুন স্বাদের উপন্যাস—'অলৌকিক' এবং 'কিশোর ফিরে এসেছিল'। একটিতে মানুষের অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয়, অন্যটিতে এক মৃত মানুষের পুনরাবির্ভাব। প্রত্যেকটি অসাধারণ। যেমন লেখায়, তেমনি বিষয়ে।

বিমল করের কিশোর গ্রন্থ-সম্ভার।

ওআণ্ডারমামা ১০·০০ কাপালিকরা এখনও আছে ১০·০০ রাজবাড়ির ছোরা ও হারানো জীপের রহস্য ১২·০০ অলৌকিক ১০·০০ কিশোর ফিরে এসেছিল ১০·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রদোষ… পরাহ…

বাঙালির সময়-জ্ঞান নেই, এ অভিযোগ বহুদিনের। দেখেশুনে মনে হয় এ-স্বভাব হয়তো চিরদিনের। তবু আশা করা যায়, সময়ের পরিবর্তনে কোনও এক সময়ে তার সময়-জ্ঞান হবে। নীচের শব্দগুলির প্রতিটির পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে। সবশেষে উত্তরের সঙ্গে মেলাবে। শব্দের অর্থও ঠিক জানতে পারবে।

১। **প্রদোষ**— (ক) উষাকাল, (খ) অপরাহ্ণ, (গ) সন্ধ্যা, (ঘ) মধ্যরাত্রি।

২। **সায়াহ্ন**— (ক) সকাল, (খ) গ্রীষ্মের সকাল, (গ) সন্ধ্যাকাল, (ঘ) দুপুর।

৩। **পরাহ**— (ক) পরাহ্ণ, (খ) দ্বিপ্রহর, (গ) পূর্বদিন, (ঘ) পরদিন।

৪। **গোধূলি**— (ক) বিকাল, (খ) সূর্যের অস্তগমন কাল, (গ) তৃতীয় প্রহর, (ঘ) বিবাহের লগ্ন।

৫। **সুবো-শাম**— (ক) সকাল-সকাল, (খ) দিনভর, (গ) সকাল-সন্ধ্যা, (ঘ) রাত-দিন।

উত্তর : ১। **প্রদোষ**— (গ) সন্ধ্যা। রাত্রি যে সময়ে আরম্ভ হয় তাকে প্রদোষ বলে। অনেক সময়ে রাত্রি অর্থেও এর ব্যবহার হয়। যেমন, 'রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে' (রবীন্দ্রনাথ)।

২। **সায়াহ্ন**— (গ) সন্ধ্যাকাল। সায় শব্দের অর্থ শেষ, অহন্ শব্দের অর্থ দিন। তাই দিনের শেষ অর্থাৎ সন্ধ্যাকাল। যেমন, 'সায়াহ্নের শেষ স্বর্ণরেখা' (রবীন্দ্রনাথ)।

৩। **পরাহ**— (ঘ) পরদিন। সংস্কৃত পর ও অহন্ শব্দ থেকে হয়েছে। পঞ্জিকায় হয়তো দেখবে, '১৪ই আষাঢ়, একাদশী, বৈষ্ণবমতে পরাহে'। তার অর্থ বৈষ্ণবদের কাছে তার পরের দিন একাদশী।

৪। **গোধূলি**— (খ) সূর্যের অস্তগমন কাল। মূল অর্থ হল, গোরুর খুরের আঘাতে ধুলো হয় যে সময়ে। যেমন, 'বিদায়-গোধূলি আসে ধুলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল' (রবীন্দ্রনাথ)।

৫। **সুবো-শাম**— (গ) সকাল-সন্ধ্যা। আরবি শব্দ সুবহ্ মানে সকাল আর ফারসি শাম শব্দের অর্থ সন্ধ্যা। যেমন, 'মোল্লারা সুবো-শাম ভাল ভাল কেতাব পুঁথি পড়েন' (মুজতবা আলী)।

দেব-সেনাপতি

বেড়ানোর ছবি

দেশবিদেশে বেড়াতে যেতে যেমন ভাল লাগে, বেড়াতে গিয়ে সেখানে তোলা পুরনো ছবি দেখতেও তেমনি ভাল লাগে। মা সেইরকম পুরনো ছবির একটা অ্যালবাম খুলে বসে ছিলেন, আর, চম্বল আর চামেলি হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল তার ওপর।

They had gone on a tour of Rajasthan some years ago. That was when these photographs were taken. The album was full of beautiful buildings, attractive scenes and happy faces of the tourists.

"This is what I like best about tours, Mummy," said Milly. "You can look at the pictures afterwards."

"Yes," Mrs Roy agreed, "and remember how much you enjoyed it all. It's only when you look back at the happy times that you realize how happy they were."

Looking at a picture, Chambal suddenly cried, "Look, Mummy, isn't this where we stayed at Jaipur?"

"Yes, that's the hotel," Mrs Roy said. "Do you remember, Chambal, it was when we had almost given up hope of getting any kind of shelter that we at last found this hotel with a room for us."

Milly asked, "Why isn't Daddy there in most of the pictures, Mummy?"

Chambal: "It was Daddy who took the pictures, silly. That's why he is not there."

Mrs Roy pointed at a picture and asked, "Do you remember this place? It's the most famous building in Jaipur."

"I know," Chambal cried. "It's the Hawamahal!"

Chameli said, "That's what I thought."

নীচের শব্দগুলি সাধারণত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার কাজে লাগে, এবারে দ্যাখো অন্যভাবে সেগুলোর ব্যবহার।

What When Where Why

That was *when* the photographs were taken.
This is *what* I like best about tours.
Isn't this *where* we stayed?
That's *why* he is not there.

প্রসাদ

নহুষ রাজার জন্মান্তর

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

ছিলেন রাজা নহুষ
একদিন কী হল জানো,
তিনি হঠাৎ নো-হুঁশ !

অসুখটা কী, ভাবতে-ভাবতে
গলদঘর্ম বিপিন আপ্তে,
যত বড়ই ডাক্তার হোন
বেজায় ছেলেমানুষ !

নহুষ রাজার অসুখটাকে
ধরতে গিয়ে পথের বাঁকে
ঘুড়ি ওড়ান যখন-তখন
কাঁদেন হুপুস-হাপুস ।

সেই না দেখে নহুষ রাজা
হাসতে-হাসতে উঠে বাজান
স্প্যানিশ গিটার, পান চিবিয়ে
বলেন অর্ধনিমীল,
"আমার নামটা কোর্টে গিয়ে
এপিঠ-ওপিঠ করেছি হে,
পুরাণতীর্থ নই আমি আজ,
নীলাদ্রি ঘোষ ডি· ফিল ।"

ইনটিরিয়ার ডেকোরেশন

রূপশ্রী দত্ত

তুলসীতলার সন্ধ্যাপ্রদীপ,
চামচ কিংবা মাথার রিবন,
রোজই উধাও একটা কিছু
অতিষ্ঠ হয় সবার জীবন ।
কোনোটাতেই নেই অরুচি
চোর বাছাধন এমনতরো ;
ছোটকাকা বলেন, 'পিন্টু,
রহস্য উন্মোচন করো ।'
দু'দিন যেতেই পিন্টু দ্যাখে
সাদামাটা ব্যাপারখানা ;
রহস্য নেই তেমন কিছু
চোরের নামটা খুবই জানা ।
তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সতর্কতা,
ধৈর্য যদি থাকত আগে,
চোর তো ধরা পড়েই যেত
পরিস্থিতি আসত বাগে ।
পাশের বাড়ির পাইপ জুড়ে
কাক-বাবাজি বানায় বাসা ;
ইনটিরিয়র ডেকোরেশন
চোরাই মালে চলছে খাসা ।

ছবি : দেবাশিস দেব

আপনি এত বড় বেইমান ? আপনার নামে আমি কেস করব...

ভূতের বাগান

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

সেই কবে ১৯৫৯ সালে গ্রাম থেকে কলকাতায় চলে আসি, তারপর আর দেশের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। আমাদের পৈতৃক বাড়ি ছিল দেওয়ানবাড়ি। সেই বিশাল অট্টালিকা এখন ভেঙেচুরে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। বাবা আর একটি ছোট বাড়ি কিনেছিলেন, সে-বাড়িও বাবা বেচে দেন। দেশের মাটিটুকুর সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়ে যাওয়ায় আমার জন্মভূমি গ্রামের সঙ্গেও আমার আর সম্পর্ক থাকে না। বছরখানেক আগে দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর পরে আবার গ্রামে গিয়েছিলাম কয়েকদিনের জন্য, আর গিয়েছিলাম বলে এক অভূতপূর্ব রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা আমার জীবনে ঘটেছিল।

আমার গ্রামে যাবার একটা কারণ ছিল। আমার বোনের শ্বশুরমশাই এক সময় একটা আমবাগান কিনেছিলেন আমাদের গ্রামে। শ্বশুরমশাই কলকাতাতেই থাকতেন। গ্রামের এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয় বিরুকাকার ওপর বাগান দেখাশোনার ভার ছিল।

বিরুকাকা আমের সময় কিছু আম কলকাতায় পাঠিয়ে দিতেন। সারা বছর তিনিই ভোগ করতেন বাগানটি। বাগানে আরও ফলের গাছ ছিল। যেমন, নারকেল, কাঁঠাল।

কালক্রমে বিরুকাকা আম পাঠানো বন্ধ করে দেন। ওঁরাও কেউ গ্রামে আসতেন না। বোনের শ্বশুরমশাই মারা যাবার পর আমার ভগ্নীপতি জামশেদপুরে চাকরি করতে চলে যান। গ্রামের বাগানের কী হচ্ছে না হচ্ছে তা নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামাতেন না। আমরাও ততদিনে গ্রাম ছেড়ে পুরোপুরি কলকাতার বাসিন্দা হয়েছি। লোক-পরম্পরায় শুনেছিলাম, বিরুকাকা বাগানটি পুরোপুরি নিজের দখলে এনেছেন। তিনি ওই জমিতে পাকা বাড়ি বানিয়েছেন। কিছু জমি লাঙল দিয়ে চাষও করেছেন। বিরুকাকার অবস্থা ভাল ছিল না। ওই বাগানের কল্যাণে তাঁর অবস্থা ফিরে গেছে। অনেকগুলি গাছ তিনি বিক্রিও করে দিয়েছেন। একজন এসে খবর দিল, কিছু জমিও নাকি তিনি বিক্রি করে দিয়েছেন।

সম্প্রতি আমার ভগ্নীপতি ক্যান্সারে মারা গেছেন। ভাগ্নেরা নাবালক। ভগ্নীপতির বয়স হয়েছিল মাত্র পঁয়তাল্লিশ। গোটা পরিবারটা ভেসে যাবার মতো অবস্থা।

শ্রাদ্ধশান্তি মিটে গেলে আমার বোন বলল, "দাদা, গ্রামে আমাদের যে পাঁচবিঘের বিরাট বাগানটা আছে, সেটা থেকে তো আমরা কিছুই পাইনে। ওটা বিক্রি করে দিতে পারো ? এখন তো জমির খুব দাম। বিক্রি করে দিলে প্রায় লাখ তিনেক টাকা পাওয়া যাবে, তাতে আমাদের বাকি জীবনটা চলে যাবে।"

আমি বললাম, "এত বছর ধরে বিরুকাকা তোদের জমি ভোগদখল করছে, ও কি আর ছাড়বে ?"

বোন বলল, "তুমি গিয়ে একটু বুঝিয়ে বলো না, দাদা। তোমার কথা শুনতে পারে। তা ছাড়া বিরুকাকাকে আমরা না-হয় হাজার দশেক টাকা দেব। যে জমিতে উনি বাড়ি

করেছেন, সেটুকু বাদ দেব। আমাদের এ-অবস্থা দেখে উনি কি শুনবেন না ?”

আমি বললাম, “ঠিক আছে, তুই যখন বলছিস, আমি গিয়ে বলব।”

দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর পরে গ্রামে গিয়ে আর কিছুই চিনতে পারি না। আমরা যখন গ্রাম ছাড়ি, তখন সবে গ্রামের চেহারাটা বদলাতে শুরু করেছে। সীমান্তের ওপার থেকে দলে দলে উদ্বাস্তু আসছে। এবার গিয়ে দেখলাম পিচের রাস্তা। বন কেটে বড়-বড় বাড়ি হয়ে গেছে। দোকানপাট, মাইক। বহু বাড়িতে টিভির অ্যান্টেনা ছাদের ওপর। বাস-রুট হয়েছে। পুরনো লোকজন কাউকে দেখছি না। সব নতুন মুখ। যে গ্রামে আমার জীবনের প্রথম তেইশ বছর কেটেছে, সেই গ্রামে আমিই আজ আগন্তুক। আমার বোনের বাগানটা ছিল গ্রামের মধ্যে। সামনে চওড়া পিচের রাস্তা। কিন্তু জায়গাটায় এসে থমকে দাঁড়ালাম। সেই ঘন আমবাগান অদৃশ্য হয়েছে। গোটা দুয়েক আমগাছ এখন অবশিষ্ট আছে। আর জমির সামনে সাইনবোর্ড ঝুলছে—প্লটে জমি বিক্রয়।

আমাকে ঘুরতে দেখে এক ভদ্রলোক বললেন, “জমি কিনবেন বুঝি ? বিরুবাবুকে খুঁজছেন ?”

আমি বললাম, “হ্যাঁ, না, মানে আপনার পরিচয়টা...”

ভদ্রলোক বললেন, “আমার নাম সাধন মিত্র। দত্তপুকুরে বাড়ি। আমিও আপনার মতো জমি কিনতে এসেছিলাম। বায়নার টাকা ফেরত নিয়ে যেতে এসেছি।”

আমি বললাম, “কেন, ফেরত নিতে এসেছেন কেন ?”

ভদ্রলোক বললেন, “আমি আমার আগের লোকদের কথায় বিশ্বাস করিনি। আপনাকেও বলছি, খবরদার, এখানে জমি কিনবেন না। এখনই ফিরে যান।”

আমার ভীষণ কৌতূহল হল। আমি বললাম “এ-কথা বলছেন কেন ?”

সাধনবাবু বললেন, “সর্বনাশা কাণ্ড মশাই। আমি জমি কেনার জন্য এসেছিলাম মাসখানেক আগে। ওই সময় দু’জন ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন যে, তাঁরা জমিটা বায়না করার পর অদ্ভুত অদ্ভুত দৃশ্য দেখছেন। যেন সব সময় তাঁদের অনুসরণ করছে একজন বৃদ্ধ। বিশেষ করে তাঁরা একলা কোথাও গেলে ওই বৃদ্ধ পিছনে-পিছনে আসছে। আবার তার দিকে এগিয়ে গেলেই সে মিলিয়ে যাচ্ছে। দুই ভদ্রলোকই একই দৃশ্য দেখেছেন। অথচ দু’জনে কেউ কাউকে চেনেন না। আমি গাঁজাখুরি গল্প বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলাম। আমি ওঁদের কথায় কান না দিয়ে জমির বায়না করলাম।

“তারপরই ঘটল সেই অদ্ভুত ঘটনাটি। আমি কলকাতা থেকে লাস্ট ট্রেনে ফিরছি। দেখি ট্রেনের ভেতর আমার ঠিক পাশেই এক বৃদ্ধ গা ঘেঁষে বসে আছে। অথচ ট্রেন প্রায় খালি। আমি খুব বিরক্ত হয়ে বললাম, ‘কী করছেন মশাই, গায়ের ওপর আসছেন কেন ?’ বৃদ্ধটি আমার দিকে মুখ কাঁচুমাচু করে চেয়ে সরে বসল। তারপর পরের স্টেশনে নেমে গেল। তার দু’দিন পরে রাত্তিরবেলা ঘুম ভেঙে গেল। কে যেন আমার পাশে বসে রয়েছে। জ্যোৎস্না-আলোতে তাকিয়ে দেখি, ট্রেনের সেই বৃদ্ধটি। সে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছে। আমি চিৎকার করে উঠতেই আমার স্ত্রী জেগে উঠলেন, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। তারপর আমি জমিটা আর একবার দেখার জন্য এলাম। উদ্দেশ্য ছিল, বিরুবাবুকে বলে যাব যে, কবে জমির রেজিস্ট্রি করব।

“বিরুবাবুকে না পেয়ে আমি একাই জমির দিকে যাচ্ছি। হঠাৎ দেখি, কে একজন আমার সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। আমি ভাল করে তাকিয়ে দেখে চমকে উঠলাম— সেই বৃদ্ধটি। একটা লাঠিতে ভর করে আমার আগে-আগে হাঁটছে। আমার পা থরথর করে কাঁপতে লাগল।

“আমাকে ওই অবস্থায় দেখে বিরুবাবু ছুটে এলেন। বললেন, ‘কী হয়েছে আপনার ?’ আমি চেপে গিয়ে বললাম, ‘শরীরটা ভাল লাগছিল না।’ তারপর বিরুবাবুকে বললাম, ‘বিরুবাবু, জমি আমি কিনব না। অসুবিধে আছে। আমার বায়না ফেরত দিন।’

“বিরুবাবু বললেন, ‘তা হয় না। টাকা ফেরত দেওয়া যাবে না।’

“আমি বলেছিলাম, ‘আলবত ফেরত দিতে হবে।’

“বিরুবাবুর নিজমূর্তি এবারে বেরিয়ে এল, তিনি বললেন, ‘ফেরত দিলে এক হাজার টাকা কেটে ফেরত দেব।’

“আমি বললাম, ‘ঠিক আছে তাই দিন।’ তিনি তখন বললেন আজ আসতে। আজ তাই এসেছি। অথচ বিরুবাবুর খোঁজ পাচ্ছি না।”

আমি বললাম, “আপনি যে বৃদ্ধকে দেখেছেন, তা সত্যি না চোখের ভুল ? আপনার চোখে কিন্তু হাই পাওয়ারের চশমা।”

ভদ্রলোক বললেন, ‘না মশায়, একবার ভুল করতে পারি, দু’বার করব না। তা ছাড়া আপনি বিশ্বাস না করেন তো নিজেই বায়না করে দেখুন না। আপনিও বুড়োকে দেখতে পাবেন।”

ভদ্রলোকের সঙ্গে তর্কে গেলাম না। দুজনে মিলে বিরুকাকার বাড়ি গেলাম।

বিরুকাকা বাড়ি নেই।

দেখা হল রাতে। আমাকে দেখে মুখে খুব খাতির করলেন বিরুকাকা। বললেন, "তোমাকে তো এখন প্রায়ই টিভিতে দেখি। কাগজে লেখাটেখাও পড়ি। তা দেশের কথা একেবারে ভুলে গেলে বাবা?"

এ-কথা সে-কথার পর আমি আসল কথা পাড়লাম। বললাম, "বিরুকাকা, এটা কি উচিত হচ্ছে? ওই বিধবার সম্পত্তি এভাবে নিয়ে নেওয়া? আপনি প্লট করে জমি বিক্রি করে দিচ্ছেন। অথচ এ-জমি যে আমার ভগ্নীপতির, তা আপনি ভালভাবে জানেন।"

বিরুকাকা বললেন, "তুমি বোধহয় জানো না বাবা, তোমার বোনের শ্বশুর পুরো জমিই আমায় বিক্রি করে যান। এই জমি আমি প্লট করে বিক্রি করছি। তুমিও একটা নিয়ে রেখে দাও। দেশের ছেলে।"

আমি রেগে গিয়ে বললাম, "আপনি এত বড় বেইমান? আপনার নামে আমি কেস করব।"

বিরুকাকা উত্তেজিত না হয়ে বললেন, "তা হলে তা-ই কোরো বাবা। আদালতেই আমি যা বলার তাই বলব।"

"তা হলে আপনি ওদের কিছুই দেবেন না?"

বিরুকাকা বললেন, "আমার জমি আমি অন্যকে দিতে যাব কেন?"

প্রবল কথা-কাটাকাটির পর আমি বিরুকাকার ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। বাগানের মধ্য দিয়ে একা-একা হাঁটছি। অন্ধকার রাত। হাতে টর্চ আছে। হঠাৎ আমি দেখলাম, আমার সামনে দিয়ে এক বৃদ্ধ যেন হেঁটে চলে গেলেন। আমি এক ঝলক দেখেই বুঝলাম যে, বৃদ্ধটি আর কেউ নন, আমার বোনের শ্বশুরমশাই।

আমার বোন আর মামলা করেনি। কে এই মামলা চালাবে? তার এত টাকাই বা কোথায়?

কিন্তু বিরুকাকা একটা প্লটও আর বেচতে পারেননি। যত খদ্দের আসে, সবাই নাকি ভয় পেয়ে চলে যায়। অপয়া বাগান বলে বাগানটির বদনাম রটে যায়।

ধীরে-ধীরে প্লটগুলিতে আগাছার জঙ্গল গজিয়ে যায়। কিছুদিন পরে বিরুকাকা মারা যান।

বিরুকাকা মারা যাবার পর বাগানটি বেওয়ারিশ হয়ে পড়ে থাকে। আমি তারপর আর কোনও খবর জানতাম না।

কিছুদিন আগে গ্রাম থেকে একটি ছেলে দেখা করতে এসেছিল। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "জমিটার এখন কী অবস্থা?"

ছেলেটি বলল, "গ্রামের ছেলেরা ওটাকে এখন খেলার মাঠ করেছে।"

আমি বললাম, "ভূতের বাগান বলে যে বদনাম রটে গিয়েছিল, সেটা এখন নেই বলো।"

ছেলেটি বলল, "নেই তা-ই বা বলি কী করে। সন্ধ্যার পর কেউ আমরা মাঠে থাকি না। অনেকেই নাকি দেখেছে, দু'জন বৃদ্ধ মাঠে পায়চারি করছেন।"

মনে-মনে ভাবি, আর-এক বৃদ্ধ কে? বিরুকাকা নাকি? ও-বাগান তা হলে এখনও তিনি ছাড়েননি!

ছবি: অনুপ রায়

ফাল্গুনে চত্তিরে

রত্নেশ্বর হাজরা

শীত পেরিয়ে বইছে গরম হাওয়া,
মজার এখন বিকেল হলেই
নদীর কাছে যাওয়া,
একটা দিঘি—একটা মাঠের পরে
লম্বা তখন খেজুর ছায়া
হিংলা নদীর চরে।
ভাঁটের বনে ফুল এসেছে
একটু তেতো গন্ধ,
আলোর ধারে কয়েকটা আকন্দ।
শুকনো আকাশ, বন্ধ মেঘের ভেলা
রামনবমীর সময় বসবে
দু'দিন ধরে মেলা।

গাঙ পেরিয়ে শীত গেছে তার বাড়ি,
ঝাঁকড়া-মাথা তালের গাছে
রস-জমানো হাঁড়ি।
বামুন পাড়ার রাস্তা ছেড়ে
মাঠের কৃষ্ণচূড়ায়
সমস্ত দিন কেউ যেন ফাগ উড়ায়।

বইছে হাওয়া হিংলা নদীর চরে,
বোষ্টমদের গান শোনা যায়
'কৃষ্ণ হরে হরে'
সন্ধ্যা যখন নৌকোতে দেয় পাড়ি।
আখড়াবাড়ির নাতনি দাদু
সবাই কণ্ঠিধারী।
ছোট্ট ছেলের মুখটি ভারি মিষ্ট—
বোষ্টুমি-মা আদর করে
নাম রেখেছে 'কিষ্ট'।

ছবি: দেবাশিস দেব

সূর্য্যের রশ্মি যখন অনবরত আপনার ত্বকের রঙ ময়লা করতে থাকে, আপনি কি ফর্সা হতে পারেন ?

আপনি জন্মেছিলেন এক বিশেষ রঙ নিয়ে। কিন্তু আজ তা অনেক পর্দা ময়লা হয়ে গেছে। আপনি জানেন — সূর্য্যের আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি কত চট্ ক'রে রঙ ময়লা করে দিতে পারে। কিন্তু ওটাই রঙ ময়লা হওয়ার একমাত্র কারণ নয়। আপনার ত্বকের ভেতরে মেলানিন্ নামে এক রঞ্জক পদার্থ আছে, যা কিছু ত্বকে অন্যের তুলনায় অনেক বেশী ছড়িয়ে পড়ে — আর যত বেশী ছড়িয়ে পড়ে, ত্বক তত বেশী কালো দেখায়।

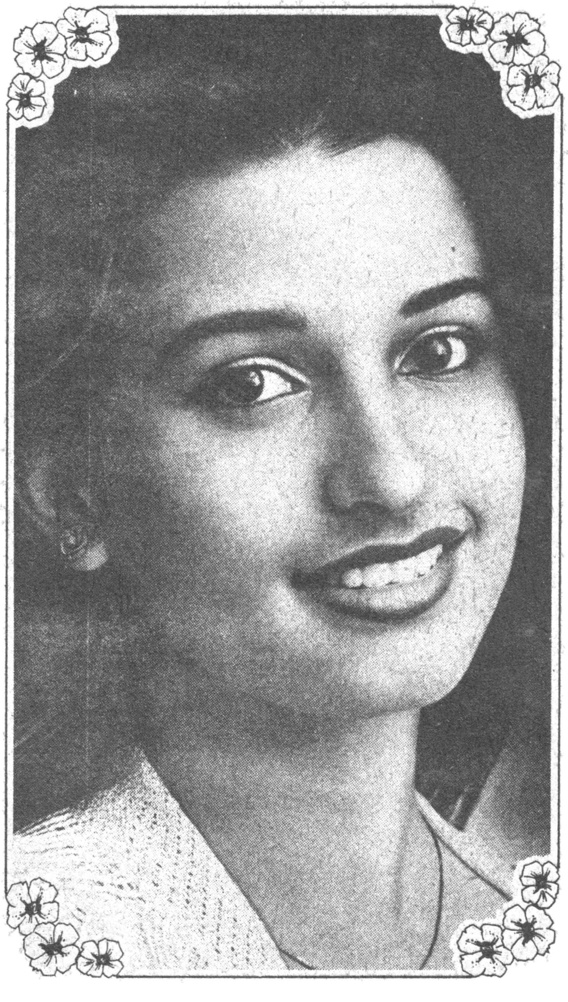

রঙ ফর্সা করার কি নতুন কোনো উপায় আছে ?

হ্যাঁ আছে ! এই প্রথম, বিজ্ঞানের এক নতুন আবিষ্কার — রঙ কালো করার প্রণালীকে নিয়ন্ত্রণ তো করেই, এমন কি তা বিপরীত দিকে চালনাও করে। ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী ! এ হ'ল রঙ ফর্সা করার ক্রীম।

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী কিভাবে কাজ করে ?

২ ভাবেঃ

<u>ত্বকের ভেতরেঃ</u> ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী রঙ কালো করার প্রণালীকে বিপরীত দিকে চালনা ক'রে, ত্বকের ভেতরে স্নিগ্ধ-কোমল আর নিরাপদভাবে কাজ ক'রে — আপনাকে এমন ফর্সা করে, যা নজরে পড়ে।

<u>ত্বকের বাইরেঃ</u> ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লীর বিশেষ 'রোদ এড়ানোর পর্দা' আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মিকে আটকে রঙ ময়লা হওয়া নিবারণ করে, অথচ আপনি সূর্য্যের যাবতীয় স্বাস্থ্যকর গুণ গ্রহণ করতে পারেন।

ফর্সা হবার জন্যে মাত্র ৬-সপ্তাহের কোর্সঃ

৬-সপ্তাহ নিয়মিত দিনে দুবার ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী মাখুন। প্রথমবার মাখার পর ত্বক হয়তো একটু চিন্‌চিন্ করতে পারে। এর মানে ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী কাজ করছে, ছ'সপ্তাহের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য সবার নজরে পড়বেই। নিয়মিত ব্যবহার করুন— আর ফর্সা হয়ে থাকুন।

ফর্সা হওয়া বা ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী
সম্বন্ধে আরোকিছু জানতে হ'লে
এঁর কাছে লিখুনঃ
ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী অ্যাডভাইজার,
পোঃ অঃ বক্স নং, ৭৫৮,
বম্বে ৪০০ ০২১।

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী
রঙ ফর্সা করার ক্রীম

হিন্দুস্থান লিভারের
একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

আপনাকে নজরে পড়ার মত ফর্সা করে...প্রকৃতির নিজস্ব কোমল উপায়ে !

LINTAS FALOV 37 2416 BG

ফ্ল্যাটবাড়িতে ইঁদুর

প্রদীপচন্দ্র বসু

"ইঁদুর ! ইঁদুর !" ড্রয়িংরুম থেকে হঠাৎ ভেসে এল ছোটপিসির আর্তনাদ। শোবার ঘরে খাটে বসে টিনটিনের মরু-অভিযান পড়ছিল বিল্টু। বই ফেলে ও গেল সবার আগে। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে লেকের শোভা দেখতে দেখতে সিগারেট খাচ্ছিলেন বিল্টুর বাবা। বোনের আর্তনাদ শুনে আধ-খাওয়া সিগারেট ফেলে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন তিনি। সবার শেষে বাথরুম থেকে পড়িমড়ি করে বেরিয়ে এসে বিল্টুর মা জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় ইঁদুর ? কোথায় ?"

"ওই তো টিভির তলায় ঘুরঘুর করছিল," ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে টিভির তলাটা আঙুল দিয়ে দেখাল ছোটপিসি। ননদের কথা শুনে আঁতকে উঠলেন বিল্টুর মা, "সে কী রে ! টিভির বারোটা বাজায়নি তো ?"

"আমি কী করে জানব ? আমাকে দেখতে পেয়ে ইঁদুরটা বইয়ের আলমারির তলায় চলে গেল।"

বিল্টুর বাবা এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। বোনের কথা শেষ হতেই বললেন, "টিভির অবস্থা পরে দেখা যাবে। তার আগে ইঁদুরটাকে মারার ব্যবস্থা করি।"

"মারবে কী গো ?" ঘেন্নায় নাক কুঁচকে ফেললেন বিল্টুর মা। "ঘরের ভেতর রক্তটক্ত লেগে একাকার হবে। তার থেকে তাড়িয়ে দাও।"

বউদির কথায় সায় দিল ছোটপিসি। বলল, "সেই ভাল।"

বিল্টু এতক্ষণ উবু হয়ে বসে আলমারির তলায় ইঁদুরটাকে দেখার চেষ্টা করছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও দেখতে পেল না। অগত্যা ছোটপিসিকে জিজ্ঞেস করল, "ইঁদুরটা কত বড় ছিল গো ছোটপিসি ?"

"বেশ বড়। আমি খুব ভাল করে দেখতে পাইনি। তবে ধেড়ে ইঁদুর বলেই মনে হল। লম্বা লেজ।" ননদের মুখে ইঁদুরের আকৃতি শুনে আর-একবার আঁতকে উঠলেন বিল্টুর মা। ধপ্ করে বসে পড়লেন সোফার ওপর। ইঁদুর আর আরশোলাকে ওঁর প্রচণ্ড ভয়। এ-ব্যাপারে ননদ আর বউদি সমান। সেজন্য স্বামীকে বলে বলে পনেরো তলার ওপর এই ফ্ল্যাট কিনেছেন। কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই। আরশোলা মারতে প্রায় রোজই স্প্রে করতে হয়। আজ আবার ইঁদুর ! এখন মনে হচ্ছে ফ্ল্যাটটা আরও উঁচুতে কিনলে ভাল হত।

তাঁকে সোফায় বসে পড়তে দেখে বিল্টুর বাবা তাড়া লাগালেন, "কী গো, বসে পড়লে যে ? একটা ঝাঁটাটাটা আনো !"

"কেন ? ঝাঁটা দিয়ে আবার কী হবে ?"

"ইঁদুর তাড়াবে।"

"কী বললে ? আমি ইঁদুর তাড়াব !" স্বামীর কথা শুনে মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল বিল্টুর মা'র, "তুমি পুরুষ মানুষ। এসব তোমার কাজ। না পারো, ছেলেকে দিয়ে করাও।"

তাঁর মেজাজ চড়ে গেছে বুঝতে পেরে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা

করলেন বিল্টুর বাবা। বললেন,, "আহা আমি কি তোমাকে তাড়াতে বলেছি। আমিই তাড়াচ্ছি ইঁদুর। তুমি শুধু ঝাঁটাটা এনে দাও। ওসব কোথায় তোমরা রাখো, তা তো আমার জানা নেই।"

স্বামীর কথা শেষ হবার আগেই রাগে গজগজ করতে করতে শোবার ঘরে চলে গেলেন বিল্টুর মা। মাকে খুব ভয় পায় বিল্টু। ঠিক মাকে নয়, মা'র মেজাজকে। সেজন্যে বাবা-মার ঝগড়া করার সময় মুখে কুলুপ এঁটে রেখেছিল। ছোটপিসিরও অবস্থা তাই। মা চলে যেতেই বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে ও জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা বাবা, ইঁদুরটা আমাদের ফ্ল্যাটে ঢুকল কী করে বলো তো?"

বিল্টুর বাবা সঙ্গে-সঙ্গে বিল্টুর প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। একটু পরে উদাস গলায় ঠোঁট উলটে বললেন, "কী জানি!"

"আমার মনে হয় টিভির অ্যান্টেনার তার বেয়ে ভেন্টিলেটারের ফাঁক দিয়ে ঢুকেছে।"

বিল্টুর এই কথা শুনে বাবা চুপ করে থাকলেও ছোটপিসি হেসে ফেললেন। বললেন, "তোর যেমন বুদ্ধি! ভেন্টিলেটারের ওই ছোট্ট ফাঁক দিয়ে একটা ধেড়ে ইঁদুর ঢুকবে কী করে রে? আর, টিভির অ্যান্টেনার তার বেয়ে ঘরে ঢুকতে হলে তো ইঁদুরটাকে আগে ছাদে উঠতে হবে।"

"তাই তো।" ছোটপিসি বুঝিয়ে বলার পর বিল্টু ভাবল, এতটা তলিয়ে দ্যাখেনি ও। বলল, "তা হলে বোধহয় লিফটে চড়ে ওপরে উঠেছে ইঁদুরটা। অবশ্য সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পারে!"

বিল্টুর কথা শেষ না হতেই কলিংবেলটা বেজে উঠল। কে যেন এসেছে।

কলিংবেলের শব্দ শুনে বাবা বললেন, "বিল্টু, এখন গবেষণা বাদ দিয়ে আগে দরজা খুলে দ্যাখ কে এল।" বিল্টু দরজা খুলতে যাবার আগে শোবার ঘর থেকে এসে দরজা খুলে দিলেন ওর মা। ঘরে ঢুকলেন বিল্টুর মেসোমশাই। ছুটির দিনে প্রায়ই মেসোমশাই বাবার সঙ্গে আড্ডা মারতে আসেন। আজ রবিবার বলে আজও এসেছেন।

ঘরে ঢুকেই সবার মুখ-চোখের থমথমে চেহারা দেখে মেসোমশাই আন্দাজ করেছিলেন একটা কিছু হয়েছে। কিন্তু কী হয়েছে ধরতে পারছিলেন না। জিজ্ঞেস করার আগেই বিল্টু জানাল ব্যাপারটা। "জানেন, আমাদের ফ্ল্যাটে না ইঁদুর ঢুকেছে।"

"ওহ!" হাঁফ ছাড়লেন মেসোমশাই। যাক, খারাপ কিছু হয়নি। তারপরই খেয়াল হল, বিল্টুর মা অর্থাৎ তাঁর ছোটশালি ইঁদুর দেখলে প্রচণ্ড ভয় পায়। সুতরাং খারাপ কিছু না হলেও যা হয়েছে খুবই সাংঘাতিক। মনে মনে একটু রসিকতা করার সাধ জাগলেও নিজেকে সামলে নিলেন উনি। বিল্টুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "ঘরে ইঁদুর থাকলে জিনিসপত্রের বারোটা বাজাবে। ওটাকে শিগ্‌গির মারার ব্যবস্থা করো।"

বিল্টু বলল, "সেই ব্যবস্থাই তো করছি আমরা।"

কথাটা বলার আগে বিল্টু খেয়াল করেনি যে, মেসোমশায়ের পেছন-পেছন মা আবার এ-ঘরে চলে এসেছেন। "আর করেছ!" ছেলের কথা শুনে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন উনি, "সেই থেকে তো বাপ আর পিসির সঙ্গে ইঁদুর কী করে ফ্ল্যাটে ঢুকল তাই নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে। ভেবেছ আমি কিছু শুনতে পাইনি? যতসব ভিতুর সর্দার!" বকা খেয়ে বিল্টুর মুখ করুণ হয়ে গেল। মেসোমশাই সেটা লক্ষ করলেন। ভাগ্য ভাল, বিল্টুকে বকেই মা চলে গেলেন অন্য ঘরে। মেসোমশাই ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বললেন, "মা'র বকায় মন খারাপ করিস না বিল্টু। মায়েদের স্বভাবই এরকম বকাঝকা করা। দাঁড়া, আমিই ব্যবস্থা করছি ইঁদুর মারার।"

মেসোমশায়ের কথা শেষ হবার আগেই কোত্থেকে ইঁদুরটা হঠাৎ বেরিয়ে এসে বিল্টুর বাবার পায়ের ওপর দিয়ে বিদ্যুদ্বেগে ছুটে গিয়ে ডিভানের তলায় ঢুকল। ঘরে এত লোকজনের কথাবার্তা শুনে বোধহয় ঘাবড়ে গেছে বেচারা। লুকোবার জায়গা ঠিক করতে পারছে না। বিল্টু দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "ওই তো, ওই তো, ডিভানের তলায় ঢুকেছে।"

বিল্টুর বাবা সেন্টার-টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আচমকা ব্যাপারটা ঘটায় উনি সেন্টার-টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। হাতের ধাক্কায় শখের কাঁচের অ্যাশট্রেটা মেঝেতে পড়ে সশব্দে ভেঙে গেল। রান্নাঘরে জামাইবাবুর জন্যে চা করছিলেন বিল্টুর মা। কাঁচ ভাঙার শব্দ পেয়ে কী হয়েছে দেখতে তাড়াহুড়ো করে ড্রয়িংরুমে ছুটে আসছিলেন। ডিভানের তলায় ইঁদুরটা ঢুকতেই ছোটপিসি ছিটকে দরজার দিকে সরতে গিয়ে বউদিকে দিল জোর ধাক্কা। ধাক্কার চোটে বিল্টুর মা পড়তে পড়তে দরজার পর্দা ধরে নিজেকে কোনওমতে সামলে নিলেন। তারপর ননদকে চড়া গলায় বললেন, "রেবা, যা নিজের ঘরে গিয়ে বসে থাক। অনেক হয়েছে তোদের ইঁদুর

মারা।"

ছোটশালির মেজাজ ঠাণ্ডা করতে তার কথায় সায় দিয়ে মেসোমশাই বললেন, "সেই ভাল। সবাই যে যার ঘরে যাও। আমি একাই ওটাকে শায়েস্তা করছি।"

মা ভিতুর সর্দার বলায় বিল্টুর মনখারাপ হয়ে গিয়েছিল। নিজের বীরত্ব জাহির করতে মেসোমশায়ের কথা শুনে ও বলল, "তুমি একা পারবে না মোটেই। আমিও তোমার সঙ্গে থাকব।"

"কে বলেছে আমি একা পারব না," বিল্টুর কথা শুনে গর্জে উঠলেন মেসোমশাই। বললেন, "জানিস আমি প্রজেক্ট টাইগারে চাকরি করি। কত কেঁদো বাঘকে শায়েস্তা করলাম। আর, এ তো একটা নেংটি ইঁদুর," একটু থেমে আবার বললেন, "তবে তুই সঙ্গে থাকতে চাইলে থাকতে পারিস।"

ছোটপিসি আর বাবা আগেই চলে গিয়েছিলেন। বিল্টুর মা মেঝে থেকে ভাঙা কাঁচের টুকরোগুলি পরিষ্কার করছিলেন। জামাইবাবুর কথা শুনে এবার হেসে ফেললেন। মেঝে থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "তোমাদের কাজ তো খাইয়ে-দাইয়ে বাঘের বংশবৃদ্ধি করা। তুমি শায়েস্তা করলে আমার ফ্ল্যাটে ইঁদুর ঝাড়েবংশে আরও বাড়বে।"

ছোটশালির কথা শুনে রেগে গেলেন মেসোমশাই। অবশ্য সত্যি রাগ কি না বোঝা গেল না। বাজখাঁই গলায় বললেন, "বিল্টু, তোমার মাকে বলো যে, বাঘ আর ইঁদুর এক নয়। অতএব কাঁচ ভাঙার টুকরোগুলি পরিষ্কার করে উনি যেন নিজের ঘরে চলে যান। তারপর যা করার আমরা করব।"

"যাচ্ছি, যাচ্ছি। অত মেজাজ দেখাতে হবে না," কাঁচের টুকরোগুলো একটা কাগজে তুলে নিয়ে মা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

মা চলে যেতেই মেসোমশায়ের নির্দেশে বিল্টু ড্রয়িংরুমের লাইট জ্বেলে দরজা জানলা সব বন্ধ করে দিল যাতে ইঁদুরটা অন্য ঘরে পালাতে না পারে। বইয়ের আলমারির পাশ থেকে বিল্টুর হকিস্টিকটা মেসোমশাই হাতে তুলে নিলেন। বিল্টুর হাতে ধরালেন ওর ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেটটা। বললেন, "দ্যাখ, বিল্টু, তুই র‍্যাকেট দিয়ে সোফার তলাটায় খোঁচাখুঁচি করে ইঁদুরটাকে বের করে নিয়ে আসবি। আমি পাজিটাকে দেখতে পেলে হকিস্টিক দিয়ে মারব মোক্ষম এক ঘা। ব্যস্, কেল্লা ফতে।"

মেসোমশায়ের প্ল্যান শুনে বিল্টু উৎসাহের সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বলল, "ঠিক আছে।"

"তা হলে আয় শুরু করি।" প্রথমে ডিভানের তলায় র‍্যাকেট ঢুকিয়ে খোঁচাতে শুরু করল বিল্টু। হকিস্টিক দু'হাতে শক্ত করে ধরে বন্ধ দরজার পাশে ফাঁকা জায়গার অপেক্ষা করতে লাগলেন মেসোমশাই। ভাবখানা যেন পেনাল্টি কর্নার মারবেন।

ডিভানের তলায় পাওয়া গেল না। বইয়ের আলমারির পাশে ফুলদানি রাখার কর্নার টেবিলের ঢাকনি তুলে খোঁচা দিতেই ইঁদুরটা বেরিয়ে এসে ভয়ের চোটে একলাফে টিভির ওপর উঠে পড়ল। স্টিক চালালেন মেসোমশাই। গোল হল না। টিভির বারোটা। টিভি থেকে একলাফে নেমে এল ইঁদুরটা।

"এই যা!" বলতে বলতে ঘুরে গিয়ে বিল্টুর পায়ের কাছে মেঝেতে স্টিক দিয়ে মারল বাড়ি। এবারও ফশকে গেল। পা বাঁচাতে বিল্টু জিমন্যাস্টিকের ভঙ্গিতে ডাইভ দিল বড় সোফার ওপর। সোফার সামনের দিকে একটা পায়া আলগা ছিল। সেটা গেল খসে।

আড়চোখে সোফাটাকে একবার দেখলেন মেসোমশাই। তারপর বললেন, "উঠে পড় বিল্টু। খোঁচা মার। খোঁচা মার। সোফার পা গেছে গেছে, তোর পা তো আস্ত আছে এখনও।"

মেসোমশায়ের তাড়ায় সোফা থেকে লাফিয়ে উঠে পড়ল বিল্টু। ইঁদুরটা আবার কোথায় ঢুকেছে দেখতে পায়নি। আন্দাজে বইয়ের আলমারির তলায় রাখা পুরনো ম্যাগাজিনের থাকের ফাঁকে র‍্যাকেট ঢুকিয়ে খোঁচা দিতেই ইঁদুরটা ছিটকে বেরিয়ে গেল। দেখতে পেয়ে মেসোমশাই চেঁচালেন, "বেরিয়েছে! বেরিয়েছে!" কোন্‌দিকে গেল? বিল্টু কিছু বোঝার আগেই মেসোমশাই একলাফে চলে গেলেন শো-কেসের পাশে। পায়ের শব্দ পেতেই ইঁদুরটা ওখান থেকে বেরিয়ে এল। দেয়ালের ধার ধরে আবার দ্রুত চলে গেল বইয়ের আলমারির নীচে। ঘুরে দেখতে গিয়ে টাল সামলাতে পারলেন না মেসোমশাই। ধপাস করে মোটা শরীরটা গিয়ে পড়ল শো-কেসের গায়ে। লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল সাজানো পুতুলগুলো। ভাঙলও দু-চারটে। তবু দমলেন না উনি। হকিস্টিকটা ঠিকমতো বাগিয়ে ধরে চোখের ইশারায় বিল্টুকে বললেন চালিয়ে যেতে। বিল্টুও থেমে ছিল না। ওর র‍্যাকেটের তাড়নায় ইঁদুরটা বন্ধ ঘরের মধ্যে আতঙ্কিত হয়ে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগল। আর, হকিস্টিক হাতে নিয়ে নাচতে-নাচতে কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো বাড়ি মারতে লাগলেন মেসোমশাই। কিছুই রেহাই পেল না ওঁর হাত থেকে। বিল্টুও খেল দু-এক ঘা। অবস্থা যখন চরমে হঠাৎ ধপ করে নিবে গেল ঘরের আলো। সব ঘুরঘুট্টে অন্ধকার। বিল্টু হতাশ গলায় বলল, "এই যা! এ তো লোডশেডিং হয়ে গেল!"

মেসোমশাইও আক্ষেপের গলায় বললেন, "যাচ্চলে!"

ডকে উঠল ইঁদুর মারা। ঘর অন্ধকার হতেই মশার দল দ্রুত আক্রমণ শুরু করল। ছোটপিসি টর্চ নিয়ে আসতে দরজা অল্প ফাঁক করে দু'জনে বেরিয়ে এসে আবার ড্রয়িংরুমের দরজাটা বন্ধ করে দিল। মেসোমশাই ফিসফিস করে বললেন, "আজ রাতটা ঘরে বন্ধ থাক। কাল খতম করব। আমি কখন আসব তোকে সকালে ফোন করে জানাব, বুঝলি বিল্টু।"

বিল্টু ঘাড় নেড়ে বলল, "হ্যাঁ।"

পরদিন সকাল আটটা নাগাদ বাবার শোবার ঘরে ফোনটা বাজতেই বিল্টু ধরল। মেসোমশায়ের গলা পেতেই ও বলল, "তোমাকে আর আসতে হবে না এখানে। বাবা পেস্ট কন্ট্রোল কোম্পানিতে খবর দিতে যাচ্ছেন। ওরাই যা করবার করবে।"

"ওহ্," ও-প্রান্তে মেসোমশায়ের গলায় হতাশা স্পষ্ট বোঝা গেল, "আর তোর মা'র খবর কী?"

"মার প্রেশার বেড়েছে বলে শুয়ে আছেন এখন। একটু বাদেই টিভি আর ফার্নিচারের দোকানে খবর দিতে বের হবেন। সব রিপেয়ার করতে হবে তো।"

বিল্টু আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই কেটে গেল ফোনের লাইন।

ছবি: জয়ন্ত ঘোষ

শয়তানের চোখ

সমরেশ মজুমদার

আগে যা ঘটেছে : সুপ্রকাশ চা-বাগানের কর্তা। তাঁর স্ত্রী কুমুদিনী পঙ্গু। ছেলে সায়ন স্কুলের ছুটিতে চা-বাগানে এসেছিল। বেওয়ারিশ ঘোড়া তাকে নিয়ে ভুটানের জঙ্গলে ঢোকে। সেখানে সুধাময় সেন তাকে বিছের কামড় থেকে বাঁচান। তিনি নাকি নেতাজির ফৌজে ছিলেন, ইংরেজদের হাতে ধরা পড়েন, পালিয়ে জঙ্গলে আছেন, বাইরের জগতের খবর রাখেন না। সায়নকে তিনি যে জংলি মানুষদের ডেরায় নিয়ে যান, তাদের পোশাকে সেই অগ্নি-চিহ্ন, যা দেখে বুধুয়া-বুড়ো ভয় পেয়েছিল। অন্যদের চোখ এড়িয়ে গুহায় ঢুকে সায়ন আক্রান্ত হয়। উদ্ধার পেয়ে দ্যাখে, দুজন বন্দীর একজনকে মেরে ফেলা হল। গুপ্ত মালের হদিস দেবার জন্যে অন্যজনকে এক অশ্বারোহী নদীর ধারে নিয়ে যায়। সেখানে দুজনেই মারা পড়ে। সায়ন বোঝে, এরা স্মাগলার, এবং সুধাময় এদের নেতা। মৃত অশ্বারোহীর ঘোড়ায় উঠে সে পালায়। কিন্তু শেষপর্যন্ত সুধাময়ের হাতে ধরা পড়ে। হঠাৎ একটা হেলিকপ্টার দেখা যায় মাথার উপরে। সুধাময় সায়নকে বলেন, "তোমাকে মেরে ফেলে আমাকে চলে যেতে হবে এক্ষুনি!" তারপর···

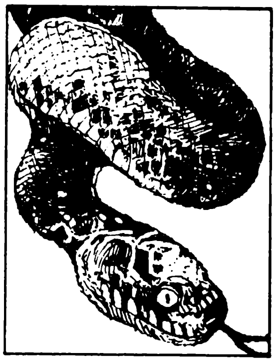

সায়ন জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি খারাপ লোক?" খ্যাক খ্যাক করে হাসলেন সুধাময়। শব্দটা যেন জোরে না হয় এ-ব্যাপারে তিনি বেশ সচেতন ছিলেন। তারপর বললেন, "আমি মোটেই ভাল লোক নই। আমি নির্দেশ দিলেই মানুষ মরে। হেলিকপ্টার যতই আমাদের খবর নিক, ইণ্ডিয়া থেকে এখানে উঠে আসার আগে আমরা অনেক সময় পাব। তোমাকে কেন ওই ঘটনাটা বলছি জানো? এই প্রথম আর এই শেষবার নিজের ভাষায় সত্যি কথা বলার মধ্যে একধরনের আনন্দ হচ্ছে আমার।"

এই সময় হেলিকপ্টারটা বোধহয় হতাশ হয়েই ফিরে গেল ভারতবর্ষে। সুধাময় সেন বললেন, "সংক্ষেপেই বলছি। ওই আহত মানুষটি ছিলেন এক ভয়ঙ্কর বন্য উপজাতি দলের নেতা। এরা দূর দূর পাহাড়ি গ্রামে গিয়ে লুঠতরাজ করত, কিন্তু কখনওই ভারতবর্ষে প্রবেশ করত না। নেতা দীর্ঘ সময় অনুপস্থিত। এরকম ক্ষেত্রে মৃত্যু খুবই স্বাভাবিক। ফলে পরবর্তী নেতা হবার জন্যে একজন ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। শুধু নিয়মানুযায়ী তাকে পূর্ণিমা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হচ্ছিল, এই সময় আমাকে নিয়ে মানুষটি তাদের গোপন আড্ডায় ফিরে আসছিলেন। পথেই নেতা হতে চাওয়া লোকটির সঙ্গে সাক্ষাৎ। সে যেন ভূত দেখল, তারপর প্রবল আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ল মানুষটির ওপর। দুর্বল এবং পঙ্গু মানুষটি তৎক্ষণাৎ মরে যেতেন, যদি আমি তাঁর সাহায্যে এগিয়ে না যেতাম।

"ইতিমধ্যে দলের অন্যান্যরা ছুটে এসেছিল। ক্ষমতালোভী লোকটিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল। নেতা তার দলের মানুষদের আমার কথা জানাল। আমার জন্যেই দু'বার প্রাণ রক্ষা হয়েছে তার। আমাকে যেন দলের সবচেয়ে সম্মানযোগ্য মানুষ হিসেবে সবাই দ্যাখে। নেতাকে সবাই খুব ভালবাসত। তার কথা মেনে নিল সবাই। নেতার কোনও সন্তান ছিল না। আমার ওপর তার স্নেহ আমাকে শক্তিশালী করে তুলল। আমি দেখলাম, এরা বেশ পটু অশ্বারোহী। তলোয়ার এবং তীর ছুঁড়তে খুবই দক্ষ। কিন্তু কোনও শিক্ষিত বুদ্ধির সংস্পর্শে আসেনি। আমি ওদের গেরিলা ট্রেনিং দিতে শুরু করলাম। ক্রমশ ওদের ভাষা আমি রপ্ত করে নিলাম। আমার মাথায় তখন অন্য পরিকল্পনা কাজ করছিল। এই দল ব্রিটিশদের তুলনায় কিছুই নয়। কিন্তু অতর্কিত হানা দিয়ে আমি ব্রিটিশদের বিব্রত করতে পারি। তবে শুধু তলোয়ার আর তীর-ধনুক নিয়ে সেটা কতটা কার্যকর করা যাবে, তাই নিয়ে সন্দেহ ছিল। আমি ওদের লোভ দেখালাম। শুধু গরিব পাহাড়ি গ্রামে লুঠতরাজ করে কী লাভ, সমতলে গেলে অনেক বেশি জিনিস পাওয়া যাবে। ওরা প্রথমে ভয় পেল। কখনওই পাহাড় ছেড়ে নীচে নামেনি ওরা। সমতলে গেলে ফিরবে না বলে একটা প্রবাদ চালু ছিল এখানে। অনেক চেষ্টার পর আমি এদের রাজি করালাম। কিন্তু তখন আমারই সঠিক ধারণা ছিল না, ভারতবর্ষ ঠিক কতটা দূরে।" এই অবধি বলেই সুধাময় সেন মাথা নাড়লেন, "বড্ড সময় নিচ্ছি। এত কথা বলার কোনও দরকার নেই। আক্রমণ শুরু করার আগে পথ চিনতে ওই নদী ধরে আমরা নীচে নেমেছিলাম। প্রথমবার অনেক সময় লেগেছিল। তারপর সহজ রাস্তা খুঁজে পেয়েছিলাম। আমি ভারতবর্ষের এত কাছাকাছি বছরের পর বছর লুকিয়ে ছিলাম অথচ জানতেই পারিনি। সঙ্গীদের বনের সীমান্তে রেখে আমি নিজে একটা বাজার মতো এলাকায় নামলাম। সেদিন সেখানে হাট বসেছিল। আমাকে হয়তো ভিখিরির মতো দেখাচ্ছিল, কিন্তু কেউ কোনও প্রশ্ন করেনি। আমি অবাক হয়ে শুনলাম ব্রিটিশরা চলে গেছে। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর নাম জওহরলাল নেহরু। এত আনন্দ হল যে কী বলব। কিন্তু তখনই পুলিশ আমাকে ধরল। থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, কোথায় বাড়ি, কেন সেখানে এসেছি। আমি তাদের সব কথা বলেছি কিন্তু কেউ তা বিশ্বাস করল না। আমাকে ওরা বিদেশী চর ভাবল। মুখ থেকে কথা বের করতে মারধোর করল।

"ভোরবেলায় সুযোগ পেয়ে পালালাম। সঙ্গীদের কাছে ফিরে আসতেই ওরা অবাক হয়ে গেল। আমার তখন ক্রোধে দিশেহারা হবার অবস্থা। যে ভারতবর্ষের মানুষের জন্যে আমরা সুভাষচন্দ্রের নির্দেশে ঝাঁপ দিয়েছিলাম, তারাই আমাকে

আগামী সংখ্যায় শুরু হচ্ছে

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের

মন-মাতানো ধারাবাহিক উপন্যাস

ডোরাকাটা জামা

(একেবারে প্রথম থেকেই পড়তে শুরু করে দাও)

এমন হেনস্থা করল। আমি লক্ষ করেছিলাম থানায় মাত্র পাঁচজন পুলিশ এবং তারা খুবই অলস ও বিলাসী। কিছু আগ্নেয়াস্ত্র নজরে পড়েছিল। সেই ভোরেই আমি সঙ্গীদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম থানায়। ওরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই দারোগার ওপর প্রতিশোধ নিয়ে সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র দখল করে নিয়ে গেলাম জঙ্গলে। সেই থেকে ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমার সমস্ত দুর্বলতা চলে গেল। তারপর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ হল এমন একটা দলের, যাদের কাছ থেকে আমরা আধুনিক অস্ত্র পেলাম। বিদেশী দামি জিনিসপত্র চালান দেবার কাজ হাতে নিলাম আমি। কেন নিলাম সে কৈফিয়ত আজ দেব না। কিন্তু আমি কখনওই সামনে যেতাম না। দলের সঙ্গে থাকতাম না। অশক্তদের বাদ দিয়ে বিশ্বাসী মানুষদের নিয়ে সুসংবদ্ধ দল গড়ে তুললাম। নেতা মারা যাওয়ার আগে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, যেন আমাকেই নেতা হিসেবে সবাই গ্রহণ করে। ওরাও বুঝেছিল আমি দলে আসার পর তাদের সবকিছুই পালটে গিয়েছে। অনেক বেশি সমৃদ্ধশালী হয়েছে ওরা। আধুনিক অস্ত্র-ব্যবহারে পটু হয়েছে।

"হ্যাঁ, আমার দলের মাধ্যমে নেপাল এবং চিন থেকে চোরাচালান যায় ভারতবর্ষে। লক্ষ লক্ষ টাকা জমা আছে আমার কাছে। কিন্তু সেটা ব্যবহার করার কোনও সুযোগ নেই। কিন্তু এখন এটা নেশার মতন দাঁড়িয়ে গেছে। আর আমারই হাতেগড়া দলটা যে স্বাদ পেয়েছে তা আমি চাইলেও পালটানো যাবে না। ব্যাপারটা বন্ধ করতে চাইলে ওরা অবাধ্য হবে। কিন্তু এখনও চোখ বন্ধ করলে আমি সেই রাতটাকে দেখতে পাই। থানায় ওরা আমাকে অকথ্য ভাষায় অপমান করেছিল, মেরেছিল। তাই আমি এতদিন পরে হানা দিচ্ছি ভারতবর্ষে। আমার লোক রয়েছে নীচে। তাদের আগুনের সংকেতে বুঝিয়ে দিই কী করতে হবে। কিন্তু তুমি আমার অমঙ্গল বয়ে নিয়ে এলে। তুমি আসার পর থেকেই অশুভ ব্যাপারগুলো শুরু হয়ে গেছে। সাপ্লায়াররা আমাদের টপকাতে চেয়েছিল এবার, হেলিকপ্টার তল্লাশি চালাচ্ছে। আর এসবই হচ্ছে তোমার জন্যে। তুমি আমাদের কালগ্রহ।" কথাগুলো বলতে বলতে কোমর থেকে একটা কুচকুচে কালো ছোট্ট পিস্তল বের করলেন সুধাময় সেন। তাঁকে এখন প্রচণ্ড রাগী বলে মনে হচ্ছিল। রক্তশূন্য হয়ে গেল সায়ন। পিস্তলটার দিকে তাকিয়ে সে কাঁদতেও ভুলে গেল। সুধাময়ের আঙুল ট্রিগারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ঠিক তখনই আচমকা সুধাময় ঘুরে দাঁড়ালেন, যেদিকে ন্যাড়া-মাথা ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বিস্মিত হবার আগেই শব্দটা বাজল। প্রচণ্ড বিস্ময় এবং যন্ত্রণায় ন্যাড়া-মাথা দুটো হাত আকাশে ছুঁড়ল। তার বুকের ওপর চলকে উঠল রক্ত। একটা পাক খেয়ে লোকটা ঢলে পড়ল মাটিতে। হো-হো করে হেসে উঠলেন সুধাময় সেন। তারপর চট করে হাসি থামিয়ে বললেন, "এই লোকটা লোভী হয়ে উঠেছিল। দলের মধ্যে আমার সম্পর্কে একটা বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করছিল। ও ইচ্ছে করেই হেলিকপ্টার দেখেও বেরিয়ে এসেছিল, যাতে আমি বিপদে পড়ি। সাপকে বড় হতে দিতে নেই।"

লম্বা পা ফেলে সুধাময় সেন এগিয়ে গেলেন লোকটার মৃতদেহের দিকে। তারপর ঝুঁকে ওর কোমরের বেল্ট খুলে রিভলভার আর গুলির বাক্স বের করে বললেন, "একটা কারণ দেখাতে হবে শব্দটার জন্যে। না, শব্দটা নয়, দুটো শব্দ, আর-একটা একটু পরেই হবে। বলতে হবে তুমি একে খুন করেছ আর তাই তোমাকে শেষ করতে হল আমাকে।" রিভলভার থেকে গুলি বের করে সুধাময় ওটা ছুঁড়ে দিলেন সায়নের দিকে, "ওটা তুলে নাও। নাও বলছি।" গলায় ধমক বাজল।

সায়ন রিভলভারটা তুলে নিল। এটার কোনও মূল্য নেই। সুধাময় আবার ঝুঁকে লোকটাকে উলটে দিলেন। তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তার পকেট দেখতে। এই সময় তাঁকে উন্মাদের মতো দেখাচ্ছিল। সায়ন তড়াক করে লাফিয়ে পড়ল নীচে। কোনওদিকে না তাকিয়ে ছুটে যাচ্ছিল নদীটার দিকে। এই সময় সুধাময় সেনের চিৎকার ভেসে এল। তিনি তাকে ক্রুদ্ধ

জেনে নাও

ড্রেনের ঢাকনা গোল কেন

পথ-চলতি রাস্তায় ড্রেনের উপরে যে ঢাকনা দেখা যায়, তা গোল। গোল মুখের উপরে গোল ঢাকনা চমৎকারভাবে বসে যায়, ঢাকনা যেমন-তেমনভাবে রাখি না কেন ! কিন্তু ঢাকনা তো চৌকোও হতে পারত। গোল মুখে ঠিকমতো গোল ঢাকনা বসলে চৌকো ঢাকনা চৌকো মুখেও ভালভাবে বসবে আশা করা যায়। কিন্তু ড্রেনের মুখ বা ড্রেনের ঢাকনা চৌকো হয় না কেন ?

ড্রেনের ঢাকনা যদি চৌকো হত, তা হলে দেখা যেত, একেবারে খাঁজে-খাঁজে না এনে ঢাকনাটিকে দাঁড় করিয়ে চৌকো মুখের উলটো দুই কোণের মধ্যে রাখলে হয়তো তার গলে যাবার একটা আশঙ্কা থাকত। চৌকো মুখে এই বিপদ হওয়া সম্ভব। কিন্তু গোল মুখে গোল ঢাকনা কখনও গলে যেতে পারে না।

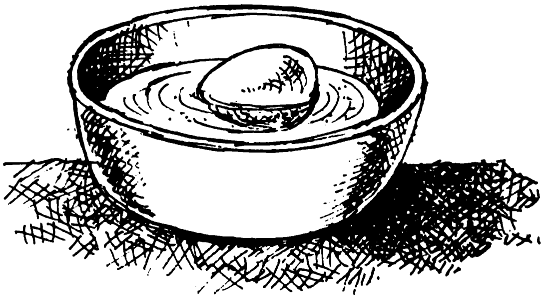

পচা ডিম নুন-জলে ভাসে কেন

খোলসের ভেতরে ডিম ভাল না পচা, বাইরে থেকে দেখে তা বোঝার উপায় নেই। তাই খোলা না ভেঙে ডিম ভাল না পচা বোঝার জন্যে একটা পরীক্ষা করা হয়। ডিম ভাল হলে তা জলে ডুবে যায়, কিন্তু পচা ডিম জলে ভেসে ওঠে।

কিন্তু পচা ডিম জলে ভেসে ওঠে কেন ?

ডিম যখন পচে যায়, তখন তার ভিতরে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস তৈরি হয়। এই গ্যাস তৈরি হয় জীবাণুঘটিত পদ্ধতিতে। ফলে ভেতরে যে সারবস্তু থাকে, তার গুরুত্ব কমে যায়। আর তাই ডিমের স্বাভাবিক ওজন কমে আসে। এই কমার ফল জলে ডিম রাখলে অনেক সময়ে তা লক্ষ করা যায়। তখন ডিম যে জল সরায় তার ওজনের চেয়ে ডিমের ওজন কম হতে পারে, অন্তত ভাল ডিমের চেয়ে কম হবে। আর সরানো জলের ওজনের চেয়ে কোনও বস্তুর ওজন যদি কম হয়, তা হলে সে বস্তু জলে ভাসবে, বিজ্ঞানের নিয়মই এই। তাই ডিম পচে গেলে তা জলে ভাসতে দেখা যায়। যদি কখনও পচা ডিম এমনি জলে না-ও ভাসে, তা হলেও নুন জলে তা ভেসে ওঠার কথা।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

গলায় থামতে বলছেন। আচমকাই পাহাড়টা শেষ হয়ে গেল সায়নের সামনে। এখান থেকে অনেক নীচে সটান নেমে গেছে পাহাড়টা। পিছন ফেরার উপায় নেই, কারণ সুধাময়ের পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। আর তখনই একটা গুলির শব্দ হল। অবাক হয়ে সায়ন দেখল তার মাথার ইঞ্চি দুয়েক ওপাশে একটা গাছের বাকল খসে পড়ল। না, আর কোনও উপায় নেই। এই সময় আবার হেলিকপ্টারের আওয়াজ উঠল। সায়ন চট করে গাছের আড়ালে চলে গেল। আর ঠিক তখনই তার খেয়াল হল, সেই সাপের কামড়ে মরে যাওয়া লোকটার রিভলভারটার কথা। এটার অস্তিত্ব সুধাময় জানেন না। এবং তখনই সুধাময় সেনকে দেখল সে। পাগলের মতো হো-হো করে হাসছেন। হাতে পিস্তলটা। সুধাময় অদ্ভুত গলায় বললেন, "কোথায় পালাবি। এইবার তোকে মারব। না, পিস্তলে নয়। গুলির দাম অনেক।" বলতে বলতে পিস্তলটাকে আবার কোমরে গুঁজলেন তিনি, "তোকে এই দু'হাতে গলা টিপে মেরে নীচে ছুঁড়ে দেব। নদীর জলে ভাসতে ভাসতে চলে যাবি।"

ওই বিকট চেহারার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল সায়ন, "আপনি শয়তান।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি শয়তান। আমার চোখ এড়িয়ে পালাবি এত সাহস তোর।" দুটো হাত প্রসারিত করে এগিয়ে আসছিলেন সুধাময় সেন। আর তখনই গুলিভরা রিভলভারটা বের করল সায়ন। সে জানে না গুলি বের হবে কি না। কখনও রিভলভার ছোঁড়েনি সে। ওটা দেখে হেসে গড়িয়ে পড়লেন সুধাময়, "গুলি ছাড়া রিভলভার আমার দিকে তাক করেছিস, হা-হা-হা।"

আর তখনই ওপরের দিকে মুখ করে রিভলভারের ট্রিগার টিপল সায়ন। প্রচণ্ড শব্দে গুলিটা ছিটকে গেল, আর হাতটা কেঁপে উঠল সায়নের। সঙ্গে-সঙ্গে পাথর হয়ে গেলেন সুধাময় সেন। বিস্ময়ে তাঁর মুখ পালটে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল সায়ন। চিৎকার করে বলল, "হাত নামাবেন না। গুলি আছে কি না সেটা তা হলে বুঝতে পারবেন।"

সুধাময় ভীত গলায় বললেন, "ওটা নামাও। আমি তোমাকে মারব না, কথা দিচ্ছি, এতক্ষণ ভয় দেখাচ্ছিলাম। গুলিভরা রিভলভার তুমি কোথায় পেলে ?"

মাথা নাড়ল সায়ন, "আপনাকে আমি বিশ্বাস করি না। আপনি শয়তান। ওই অবস্থায় ঘুরে দাঁড়ান। হ্যাঁ, এইবার এগিয়ে যান সামনে। অন্য কিছু করলেই কিন্তু গুলি করব।"

দুটো হাত মাথার ওপরে, সুধাময় বাধ্য হলেন খোলা জায়গায় হেঁটে আসতে। তাঁর কিছুটা তফাতে সায়ন। তার হাতে রিভলভারটা কাঁপছে। কিন্তু সেই সময় হেলিকপ্টারটা নেমে এসেছে নীচে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর তল্লাশকারীরা দেখতে পেয়েছেন তাদের। তারপর হেলিকপ্টারটা মাথার ওপরে স্থির হল। সায়ন দেখতে পেল, একটা দড়ির সিঁড়ি নেমে আসছে ওপর থেকে। আর তখনই বাবার মুখ দেখতে পেল সে। হেলিকপ্টারের দরজায় ঝুঁকে তিনি চিৎকার করলেন, "খোকা, ওইভাবে থাক, আমরা নেমে আসছি।"

(সমাপ্ত)

ছবি : অনুপ রায়

প্রযুক্তির বিচিত্র খবর

সুজিতকুমার নাহা

কথা-বলা দড়ি

ইংল্যান্ডের একটি প্রতিষ্ঠান এক বিচিত্র দড়ি তৈরি করেছেন। দেখতে একদম সাধারণ রজ্জুর মতো হলে কী হবে, এই দড়ির আছে একটা আশ্চর্য গুণ। এটির সাহায্যে দু'প্রান্তে থাকা দু'জন লোক খুব সহজেই পরস্পর কথাবার্তা চালাতেও পারবেন। পর্বতারোহীদের সুবিধের জন্যই প্রথমে এই ধরনের দড়ি তৈরি করা হলেও আরও অনেক কাজেই এখন এই অভিনব দড়ি ব্যবহার করা হচ্ছে।

এবার এসো, আমরা কথা-বলা দড়ির রহস্যটা জেনে নিই। এই দড়ির ভেতরে লাগানো থাকে একটি 'কেব্‌ল' বা তার, যার দৌলতেই দুই প্রান্তের দুজন যোগাযোগ রাখতে পারেন নিজেদের মধ্যে। তারটি খুবই বিশেষ ধরনের, কাজেই দড়িটিকে তুমি গোল করে গুটিয়েই রাখো, এটি দিয়ে গেরোই বাঁধো, বা ভারী মালের সঙ্গে লটকে দিয়ে দলবল নিয়ে হেঁইও হেঁইও করে টানাটানিই করো, তারটির কিন্তু বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে না। দড়ির দুই প্রান্তের দু'জনের গলাতেই লাগানো থাকে 'থ্রোট মাইক্রোফোন', আর কানে থাকে হেডফোন। এই দড়ির সাহায্যে পাঁচ কিলোমিটার দূর থেকেও দু'জন লোক কথা বলতে পারেন স্বচ্ছন্দে।

কথা-বলা দড়ির এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন এক প্রযুক্তিবিদ্

গোল করে গুটিয়েই রাখো, বা গেরোই বাঁধো, বা ভারী মালের সঙ্গে লটকে দিয়ে টানাটানিই করো, এই তারের তাতে বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে না

ঠাণ্ডা আলো

ঠাণ্ডা আলো তৈরিতে জোনাকিরা যে রীতিমত পারদর্শী সে-কথা সকলেরই জানা। আশ্চর্যের কথা, বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে এখন কিন্তু কৃত্রিমভাবেও ঠাণ্ডা আলো তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। জাদুদণ্ডের মতো চেহারার অভিনব এই বাতিটির নাম দেওয়া হয়েছে 'আলোক-দণ্ড' ('লাইট-স্টিক')।

এই বাতিটি আসলে একটি স্বচ্ছ ও নমনীয় নলবিশেষ, যেটির ভিতরে থাকে একটি রাসায়নিক পদার্থ এবং সিল-করা একটি কাঁচের শিশি। এই শিশিটির মধ্যে থাকে আরও একটি রাসায়নিক পদার্থ।

এই বিচিত্র বাতিটিকে জ্বালাতে হলে কোনও সুইচ টিপতে হয় না, বা কোনও দেশলাইয়েরও দরকার পড়ে না! শুধু বাইরের নলটিকে বাঁকিয়ে ভেতরের শিশিটিকে ভেঙে ফেললেই হল। দুটি রাসায়নিক পদার্থ পরস্পরের সংস্পর্শে এলেই জ্বলে ওঠে সবুজ রঙের ঠাণ্ডা আলো। এই আলোর ঔজ্জ্বল্যও নেহাত কম হয় না। বাতিটির পাশে বসে বইপত্র পড়া যায়।

যে-সব স্থানে সাধারণ আলো জ্বালানো বিপজ্জনক, সে-সব ক্ষেত্রে এই ঠাণ্ডা আলোর ব্যবস্থা করলে বিপদের আশঙ্কা থাকবে না একেবারেই। ঠাণ্ডা আলোর এই সুবিধের জন্য অনেক বিমান-কর্তৃপক্ষ 'লাইট-স্টিক' মজুত রাখছেন, বিমানগুলোতে যাতে প্রয়োজনের সময় আপৎকালীন নির্গম-পথ ও সিঁড়িটিকে আলোকিত করা যায় এগুলো দিয়ে।

ট্রেন ধ্বংস হল একটা পাত্রের ঠোক্করে

তিনতলা বাড়ির ছাদ থেকে ছুঁড়েই ফ্যালো বা চলন্ত ট্রেনের সামনে নিক্ষেপই করো, অসাধারণ মজবুত এই পাত্রটার কোনও ক্ষতিই হবে না। আটচল্লিশ টন ওজনের ইস্পাতের এই পাত্রটাকে প্রযুক্তিবিদেরা এমনভাবে তৈরি করেছেন যে, যেদিক থেকেই এটির ওপর প্রচণ্ড আঘাত করা হোক না কেন, ভাঙা দূরে থাকুক, সামান্য আঁচড়ের দাগ ছাড়া পাত্রটির ওপর আর কোনও চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না।

ট্রেন ধ্বংসের ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক হলেও সত্যিই ঘটেছিল বছর দেড়েক আগে। পাত্রটা কত মজবুত সেটা পরীক্ষা করে দেখার জন্য একটা নাটকীয় ট্রেন সংঘর্ষের আয়োজন করা হয়েছিল। ইঞ্জিন ও তিনটি কামরা সমন্বিত ২৪০ টন ওজনের একটা রেলগাড়ি তীব্রগতিতে ছুটে এসে লাইনের ওপর ফেলে রাখা পাত্রটার ওপর ধাক্কা লাগায়। সংঘর্ষের ফলে রেলগাড়িটা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু পাত্রটাকে কিছু দূরে পড়ে থাকতে দেখা যায় অক্ষত অবস্থায়!

নিমেষে পরিষ্কার

বাস, ট্রেন বা উড়োজাহাজের অভ্যন্তরভাগকে চটজলদি সাফ্-সুতরো করে ফেলবার এক দারুণ উপায় উদ্ভাবন করেছেন সুইডেনের একটি প্রতিষ্ঠান। আশ্চর্যের কথা, এই অভিনব পদ্ধতিতে কোনওরকম ঝাড়ন, বুরুশ বা ঝাঁটার সাহায্য ছাড়াই যানের অভ্যন্তরভাগ ঝকঝকে তকতকে হয়ে ওঠে এক মিনিটেরও কম সময়ে!

তোমাদের নিশ্চয় জানতে ইচ্ছে করছে, কীভাবে এত তাড়াতাড়ি বুরুশ-টুরুশ ছাড়াই ঝাড়-পোঁছের ব্যাপারটা সম্পন্ন হয়ে থাকে। আসলে, সমস্ত কেরামতির মূলে আছে এক ঝলক তীব্র বাতাসের স্রোত।

টিনটিন * হার্জ

আরে, তাই তো, জাহাজটা তো সত্যি চলে যাচ্ছে। হতভাগা ক্যাপ্টেন আমাদের দেখতে পায়নি!
ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে!
একটা আয়না দিতে পারো?
আয়না দিয়ে কী হবে?
এই নিন!
চিরুনিও আছে। দেব?
আ, এতক্ষণে বুঝেছি!
শুধু আয়না হলেই চলবে
সূর্যের আলো যেন হতভাগার একেবারে মুখের উপরে গিয়ে পড়ে!
সেই চেষ্টাই তো করছি!
স্টারবোর্ডের দিকে কেউ আলো ফেলছে সার্।
ওই দেখুন!
একটা ভেলায় তিনজন লোক!
কী বললে… ? ভেলায় তিনজন লোক ?… আমি আসছি। আর হ্যাঁ, যাত্রীদের কাউকে কিছু বোলো না।
ওই দেখুন মিলর্ড! একটা কুকুরও রয়েছে!
টিনটিন! সর্বনাশ! মুল পাশার খবর তো ঠিক নয়!
জাহাজের মুখ ঘোরাব?
কী দরকার? বোঝোই তো, ভেলায় চড়ে অনেকে আজকাল সাগর পাড়ি দিচ্ছে! না না, ওরা কোনও সাহায্য চায় না!
কিন্তু মিলর্ড…
যা বলছি, করো। আরে, এটা ওদের খেলা…না না, ওরা বিপদে পড়েনি! আর হ্যাঁ, আমাদের যাত্রীদের কাউকে এ নিয়ে কিছু বোলো না!

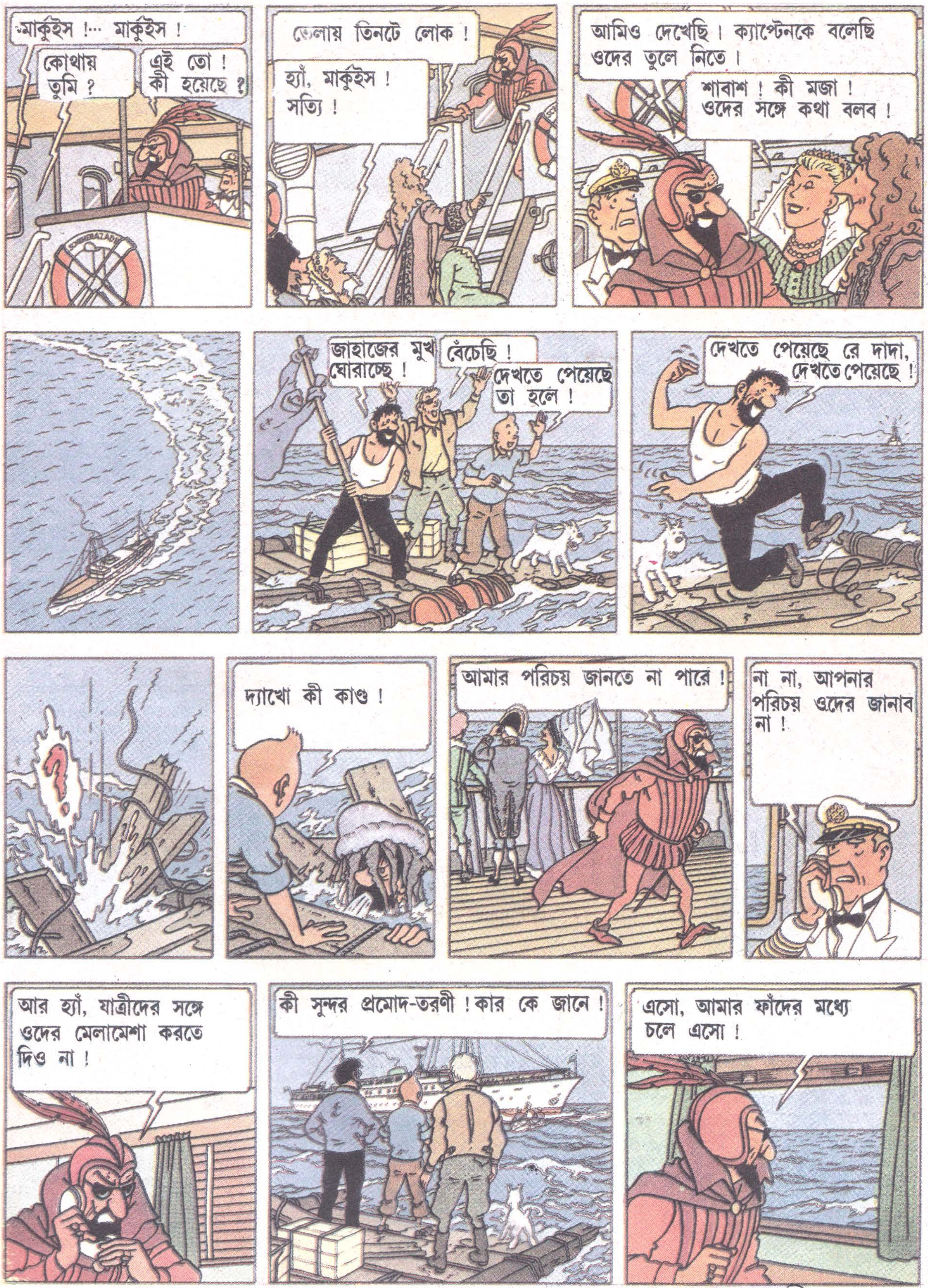

কপিরাইট : কাস্টারম্যান এস. এ.

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়
মেলচেস্টার রোভার্স
মেলচেস্টার রোভার্স কি দ্বিতীয় ডিভিশনে নেমে যাবে ?
জিওফ গাইলসকে বেচে দেওয়ায় সবাই নিন্দা করছে রয়ের । গোলে চার্লি যাচ্ছেতাই খেলায় স্ট্যামব্রিজ সিটির কাছে হেরেছে রোভার্স। রয়ের সামনে মস্ত সমস্যা । তার মুখ দেখে অবশ্য তা বুঝবার উপায় নেই ।...
টিভিতে 'খেলার খবর' শুরু হচ্ছে...
আসছি, পেনি।
চল্, দেখা যাক !
লিগ-টেবিলের তলার দিকে ধুঁকছে রোভার্স । দ্বিতীয় ডিভিশনে নেমে যাবার অভূতপূর্ব বিপদ দেখা দিয়েছে ।
'অভূতপূর্ব' কেন ? এমন বিপদ আগেও এসেছে ।
রোভার্স বার্নডিন ওয়ালফোর্ড রেডস্টোক
রয় অবশ্য দারুণ খেলছে। স্ট্যামব্রিজ সিটির বিরুদ্ধে কীভাবে সে গোল করেছিল, দেখুন...
ভালই খেলি দেখছি !
জিতেছিল কিন্তু স্ট্যামব্রিজই । জিওফ গাইলসের বদলি এখনও মেলেনি । এদিকে চার্লিও সেদিন খুব বাজে খেলেছে । রোভার্সের অবস্থা এখন সত্যিই শোকাবহ ।
বাচ্চা হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল...
হাসির কথাই বটে !
কী হচ্ছে রয় ? ওকে আশকারা দিও না ।
রোভার্সের অবস্থা সত্যিই তো খুব খারাপ ।
মোটেই খারাপ নয় ।
একমাত্র সমস্যা চার্লি...
গাইলসের নয়, চার্লির বদ্‌লি জোগাড় করতে হবে । দেখি ডেনফিল্ড ইউনাইটেডের ম্যানেজারকে বলে অ্যান্ডি ওয়টসনকে পাওয়া যায় কি না ।

পরদিন সকালে...
অ্যান্ডির দাম তিন কোটি টাকা ?
হ্যাঁ, ওই দাম পেলে ছাড়তে পারি ।
তোমার মাথা খারাপ হয়েছে ! নাকি ভাবছ, আমাকে বাগে পেয়ে মোচড় দিয়ে টাকা আদায় করবে ? গুডবাই !
গুডবাই
আমার দাম তিন কোটি ? বলো কী ?
তোমাকে বেচতে চাই না বলেই বেশি দাম হেঁকেছি । যাও...
মন দিয়ে প্র্যাকটিস করো ! ...যাও !
যাচ্ছি, বস !
রোভার্সের ট্রেনিং গ্রাউন্ডে জেনারেল ম্যানেজার বেন গ্যালোয়ের সঙ্গে কথা বলছে রয়...
গর্ডন স্টুয়ার্টকে কিনলেই তো হয় !
তা হয়, কিন্তু...
টাইনফিল্ড ওকে এখন ছাড়বে বলে মনে হয় না ।
অগত্যা আমাদের 'বি' টিমের কাউকে দিয়েই কাজ চালাতে হবে । দিন কয়েক ধরে এই ছেলেটাকে দেখছি...
নাও, কয়েকটা পেনাল্টি আটকাও !
রেডি ?
যাঃ !
কিন্তু ও তো অন্য দিকে ঝাঁপাল !
হুম, ছেলেটার নাম ওয়াল্টার উইলিয়ামস !
এই ছেলেকে মেলবরোর বিরুদ্ধে আমাদের খেলায় নামাবার কথা ভাবছ নাকি ?
এই ছেলে কি মেলবরোর বিরুদ্ধে গোলে খেলতে পারবে ?
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

দাদুভাই

পরেশ দে

সবাই আজ বাড়ি চলে গেছে টুটুদের বাড়িটাকে ফাঁকা করে দিয়ে। শেষে পিসিও চলে গেলেন। পাঁচিল-ঘেরা বিশাল বাড়িটা খাঁ-খাঁ করছে। গিলতে আসছে যেন। বাড়িতে টুটু আর মা। বাবা অবশ্য বলে গেছেন, পিসিকে পৌঁছে দিয়েই ফিরে আসবেন। সন্ধের মধ্যে।

সকাল থেকেই দাদুভাইয়ের জন্যে টুটুর বড্ড মন কেমন করছে। অথচ সে-কথা টুটু কাউকে বলতেও পারছে না। হাটবার আজ। দাদুভাই থাকলে পাঁচপাড়ার গয়লাবুড়ির কাছ থেকে কাঁঠালপাতায়-মোড়া চাঁচি কিনে এনে দিতেন তাকে। কেমন সুর করে বলতেন, 'চাঁচি খাবে কে, কে খাবে চাঁচি ?' অমনি কোথা থেকে ছুটে আসত টুটু। দাদুভাইয়ের পা-দুটো জাপটে ধরে বলত, 'আমায় দাও দাদুভাই, আমায় দাও। আমি খাব।' ফোকলা দাঁতে মিষ্টি হেসে টুটুকে কোলে তুলে নিতেন দাদুভাই। ফতুয়ার পকেট থেকে একটা-একটা করে চাঁচির মোড়ক তুলে দিতেন টুটুর হাতে। টুটু একটা মোড়ক দাদুভাইয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলত, 'তুমি খাবে না, দাদুভাই ? এই নাও, তুমি একটা খাও, আমি একটা খাই।' দাদুভাই বলতেন, 'না না, তুমি খাও, খেয়ে বাঁচলে মাকে বরং একটু দিও। আমি হাটে পেট-ভর্তি করে খেয়ে এসেছি।' টুটু তখন কোল থেকে নেমে পেট দেখতে চাইত, 'দেখি, তোমার পেট দেখি, মিথ্যে কথা, তুমি হাটে খাওনি।' টুটুর চোখ ছলছল করে উঠল। আজ যেন বড্ড বেশি বেশি দাদুভাইয়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে তার।

টুটু বন্ধুর দেওয়া ছোট্ট ক্যালেণ্ডারটা বার করল। ক্যালেণ্ডারের খুদে খুদে তারিখের খোপগুলোয় সে রোজ একটা করে পেন্সিলের দাগ দিয়ে রাখে। কাটা দাগ। আজকের তারিখটার উপরেও সে একটা কাটা দাগ দিল। তারপর কটা হয়েছে গুনতে আরম্ভ করল। এক, দুই, তিন...মোট একত্রিশটা। মাসটাও শেষ হয়ে গেল। টুটু হিসেব করে দেখল, দাদুভাই একত্রিশ দিন হল মারা গেছেন। হঠাৎ দাদুভাইয়ের বাঁধানো ছবিটার দিকে চোখ চলে যায় তার। মনে হল, দাদুভাই তারই দিকে তাকিয়ে আছেন। দেখছেন তার কাণ্ডকারখানা। দাদুভাইয়ের কাছে এভাবে ধরা পড়ে গিয়ে টুটু বেশ লজ্জা পেয়ে যায়। ইশ, ব্যাপারটা কী করে চাপা দেবে এবার। আফসোস করে সে। দাদুভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বোকার মতো হেসে ফেলে। মা বাইরে দাওয়ায় বসে চুল বাঁধছেন। ঘরের ভেতর টুটু একা। দাদুভাইয়ের চোখে চোখ।

একটু সরে বসল টুটু। দেখল, দাদুভাই তখনও তার দিকে তাকিয়ে আছেন। টুটুর মুখটা থমথম করে ওঠে। চোখ উপচে জল গড়িয়ে পড়ে গাল বেয়ে। ফোঁপাতে-ফোঁপাতে এগিয়ে যায় দাদুভাইয়ের ছবিটার দিকে। তারপর খুব আস্তে করে ডাকে, "দাদুভাই।"

গতকাল বাড়িভর্তি লোকজন ছিল। অনেক আত্মীয়-কুটুম এসেছিল ওদের বাড়িতে। পাড়ারও অনেকে খেতে এসেছিল। বাবা বাড়ি বাড়ি গিয়ে নেমন্তন্ন করে এসেছিলেন সব্বাইকে। কিন্তু পিসি ছাড়া কেউই টুটুর সঙ্গে দাদুভাইয়ের কথা বলেননি। একদিন টুটুকে কোলে নিয়ে পুকুরঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বলেছিলেন, "হ্যাঁ রে টুটু, তোর দাদুভাইকে মনে পড়ে ?" কথাটা শুনে টুটু তো হাঁ। মনে পড়ে মানে! সবসময়ই তো পড়ে। সবসময়ই তো সে দাদুভাইয়ের কথা ভাবে। দাদুভাইকে কি কখনও ভোলা যায়! ছবিটা আছে বাবার ঘরে। কাচের ভেতর থেকে কেমন হাসি-হাসি মুখ করে তাকিয়ে থাকেন দাদুভাই, তুমি দেখতে পাও না! মুখে এলেও, পিসির কথার উত্তরে টুটু এসব কিছুই বলতে পারল না। সব কথা কি সবাইকে বলা যায়। সে শুধু ছোট্ট করে বলল, "হ্যাঁ।"

পিসিও চলে গেলেন আজ। আবার কবে আসবেন কে জানে। যাবার সময় পয়সা দিয়ে চুমু খেয়েছিলেন পিসি। দাদুভাইয়ের কথা বড় একটা কেউ বলে না আজকাল। টুটু ভাবে, দাদুভাইকে কি সত্যিই তাহলে ভুলে গেল সবাই। দাদুভাইয়ের কথা শুনতে তার এত ভাল লাগে। কিন্তু বলবে কে ? পিসি বরং আর ক'দিন থাকলে ভাল হত।

মা নিষেধ করলেও টুটু মাঝে-মাঝেই দাদুভাইয়ের ঘরে ঢুকে পড়ে। তার মনে হয়, দাদুভাই আছেন, কোথাও গেছেন হয়তো, এক্ষুনি ফিরে আসবেন। পা ঝুলিয়ে বসবেন খাটে।

টুটুকে জিজ্ঞেস করবেন, 'দাদুভাই, আজ একটু বেড়ু করতে যাবে নাকি ?'

বাঁশবাগানে অন্ধকার নামছে, আবছা অন্ধকার। বড্ড গরম আজ। গাছের পাতা নড়ছে না একটুও। টুটু দেখল, মা তুলসীতলায়, দাদুর ছবির সামনে, ঠাকুরঘরে প্রদীপ দেখালেন হাত ঘুরিয়ে। ঠাকুরঘরে প্রদীপ নামিয়ে প্রণাম করলেন গড় হয়ে। ঠিক এই সময় টুটু বেড়ানো শেষ করে দাদুভাইয়ের হাত ধরে বাড়ি ফিরত। কালীতলায় ঝন-ঝন করে কাঁসি বেজে উঠল। কাদের ঘর থেকে শাঁখের শব্দ ভেসে আসছে।

মা আলো জ্বালিয়ে টুটুর কাছে এসে বসলেন। বললেন, "টুটু, বইপত্তর গুছিয়ে নাও, কাল থেকে স্কুলে যাবে।"

"তুমি এখন পড়াবে, মা ?"

"না আজ থাক। কাল থেকে পড়াব'খন।"

"মা, বাবা কখন আসবে ?"

"এক্ষুনি এসে যাবেন, কেন, তোমার ভয় করছে ? এসো, আমার কোলে এসো।" মেঝেতে পা ছড়িয়ে মা টুটুকে কোলে টেনে নিলেন। গলার ঘাম মুছিয়ে দিলেন আঁচল দিয়ে। কপালে নেমে আসা চুলগুলো ঠিক করে দিল। মায়ের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে টুটু জিজ্ঞেস করল, "মা, ও মা, পলাশডাঙার ওই গাছগুলো দেখেছ ?"

"কোন গাছগুলো ?"

"ওই যে গো অশ্বত্থ, বেল, খেজুর, বুড়োবট, দ্যাখোনি ?"

"হ্যাঁ, সে আবার দেখার কী আছে ? তোমার বুঝি এখন তাই মনে পড়ল ?"

"কেমন, না ? বুড়োবটের তলায় দাঁড়ালেই তো শ্মশানঘাটটা দেখা যায়, নদীর ধারে। সেই যে গো, দাদুভাইকে যখন ওরা নিয়ে চলে গেল, তুমি আমি কতক্ষণ ধরে বুড়োবটের তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। ভুলে গেলে ? সেই যে তুমি কাঁদতে-কাঁদতে কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করলে। মনে পড়ছে না তোমার ?"

টুটুর মা কিছু বলল না। চুপচাপ তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ টুটুর মুখের দিকে। টুটু বুঝতে পারল না, সে কিছু ভুল বলেছে কি না।

কোল থেকে টুটুকে নামিয়ে মা ঠাকুরঘরে ঢুকলেন। লাল ঘুনসিতে বাঁধা একটা মাদুলি নিয়ে এসে বললেন, "টুটু, এটা পরো তো সোনা। কমলদাদু দিয়ে গেছেন আজ সকালে, ভাল হবে, ভয় পাবে না, পড়া মনে থাকবে। দেখি, হাত দেখি। বাঁ হাত নয়, ডান হাতে পরতে হয়। মা লাল সুতোয় আটকানো মাদুলিটা বেঁধে দিলেন টুটুর হাতে।

টুটুর বড্ড রাগ হয়ে যায় এইজন্যে। সব কথাতেই মা মনে করে টুটু ভয় পাচ্ছে। টুটু ভেবেছিল, পলাশডাঙার বুড়োবটতলার কথা বলবে মাকে। সেই সঙ্গে দাদুভাইয়ের কথাও। বুড়োবটের তলায় বসে দাদুভাইয়ের সঙ্গে তার কেমন গল্প হত, সেই সব।

যখন খুব গরম পড়ত, দাদুভাই তখন রোজ টুটুকে নিয়ে বেড়াতে যেতেন বুড়োবটতলায়। রোজ বিকেলে। বাঁধানো গোল বেদীতে বসে দাদুভাইয়ের সঙ্গে কত গল্প হত টুটুর। যা জানতে চাইত সে, তাই জানাত দাদুভাই। টুটু তখন আরও ছোট ছিল। একদিন জিজ্ঞেস করে বসেছিল, 'দাদুভাই, ওই যে সূর্যটা নেমে যাচ্ছে, তারপর কী হবে ? গড়াগড়ি খাবে মাটিতে ?'

দাদুভাই সেদিন খুব হেসেছিলেন একচোট। তারপর অবশ্য টুটুকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, পৃথিবী কেমন করে সূর্যের চারদিকে পাক খাচ্ছে। কিছুই বুঝতে পারেনি টুটু। মুখে বলেছিল, হ্যাঁ বুঝেছি। আসলে টুটু ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারেনি। সূর্য নাকি পৃথিবীর থেকে অনেক বড় ! টুটুর মনে হয়েছিল, যাঃ, তাই কখনও হয়! হলই বা অনেক দূরে।

মাঝে-মাঝে দাদুভাইয়ের সঙ্গে টুটুর লুকোচুরি খেলা হত। বুড়োবটের আড়ালে টুটু লুকোত, আর দাদুভাইকে খুঁজতে হত। সেসব কথা মাকে বলতে গিয়েও বলা হল না। রাগ করে টুটু আর কোনও কথা বলল না মাকে।

চারদিক আলোয় আলো। কোনও মানুষ চোখে পড়ে না। কোনও শব্দ আসে না কানে। শুধু নৈঃশব্দ্য, সবুজ মাঠ আর সারি-সারি গাছ। সব কিছুই ঝকঝকে। বোঝা যায় না দিন কি রাত। অজস্র ফুলের ভারে নুয়ে পড়েছে গাছগুলো। ফুলের মিষ্টি গন্ধে বাতাস ভারী।

দূরে দু'জন লোক চলে গেল হনহন করে। খালি গা। গা দিয়ে যেন আলো ঝরে পড়ছে। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলল না। তাকাল না পর্যন্ত। যেন খুব ব্যস্ত, এমনভাবে চলে গেল।

আরও দূরে আঁকাবাঁকা পথে বয়ে চলেছে একটা নদী। তার জল থেকেও যেন আলো ছিটকে পড়ছে। জল নয়, যেন গলানো রুপো। দুপাড়ে বিশাল এলাকা জুড়ে চিকচিক বালি। হঠাৎ কতকগুলি উজ্জ্বল আলো দেখা গেল সেখানে। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে টুটু বুঝতে পারল, ওগুলো আলো নয়, তারই বয়সী কয়েকটি ছেলেমেয়ে। খেলা করছে বালির ওপর। খেলতে খেলতে হঠাৎ যেমন এসেছিল, তেমনি হঠাৎই অদৃশ্য হয়ে গেল। দেখতে দেখতে টুটু অবাক হয়ে যাচ্ছিল।

টুটু বসে ছিল একটি গাছের তলায় । শ্বেতপাথরের একটা বেদীর উপর । মাথার উপর ফুলগাছ । একই গাছে নানা রঙের ফুল ফুটে আছে । লাল, নীল, গোলাপি, হলুদ, আকাশি নীল—আরও কত রঙের ফুল । সে-সব রঙের নাম জানে না টুটু । সবুজ ঘাসের ওপর ফুল পড়ে আছে কত ! শুকোয়নি একটাও । সবই টাটকা, তাজা । ফুলসমেত গাছের ডাল মাটি ছুঁই-ছুঁই । চাইলে দু-একটা ফুল হাত বাড়িয়ে ছিঁড়ে নিতে পারে টুটু । কিন্তু ইচ্ছে করল না তার । ফুলের গন্ধ ঢুকছে নাকে । প্রজাপতি উড়ছে ফুলে ফুলে । কীসব বাহারি রঙ । বেদীতে বসে অবাক হয়ে দেখছিল টুটু । এত সুন্দর জায়গা সে কখনও দ্যাখেনি ।

হঠাৎ টুটু দেখল, কে যেন তার দিকে এগিয়ে আসছে । খালি গা, কাঁধে পৈতে, পায়ে খড়ম । তাঁর শরীর থেকেও তীব্র আলো ঠিকরে পড়ছে চারদিকে । এত আলো যে, টুটুর চোখ ঝলসে যাচ্ছে । অনেকটা এগিয়ে আসার পরে টুটু চিনতে পারল । তার দাদুভাই । টুটু থ হয়ে গেল দাদুভাইকে দেখে । দু-চোখ ভরে দেখতে লাগল । কিন্তু আগের মতো ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরতে পারল না । বলতে পারল না, দাদুভাই তোমার জন্য আমার কত কষ্ট । কে যেন তাকে শ্বেতপাথরের বেদীটার সঙ্গে আটকে দিয়েছে ।

মাত্র তিন-চার হাত দূরে দাঁড়িয়ে দাদুভাই । স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে । মুখে সেই চেনা হাসি । কিছুক্ষণ পরে দাদুভাই বললেন, "আমায় চিনতে পারো ?" টুটুর মনে হল দাদুভাইয়ের কথাগুলো অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে । দাদুভাইয়ের প্রশ্ন শুনে টুটু বেশ অবাক হয়ে গেল । দাদুভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "হ্যাঁ পারি, তুমি তো আমার দাদুভাই ।"

"এত কষ্ট পাচ্ছ কেন ? আমি আছি ।"

"তুমি কোথায় আছ, দাদুভাই ?"

"আমার ইচ্ছের মধ্যে আছি ।"

"কী তোমার ইচ্ছে ?"

"তুমি কি ভুলে গেলে, কী আমার ইচ্ছে ।"

টুটু অস্থির হয়ে পড়ে । আকাশ-পাতাল চিন্তা করে মনে করার চেষ্টা করে । সব গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে তার । কান্না এসে যাচ্ছে । খানিক পর টুটু প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, "না না, দাদুভাই, ভুলিনি, সব মনে আছে, আমার সব মনে আছে ।"

"কী মনে আছে বলো ?"

"তোমার তিনটে ইচ্ছে ছিল ।"

"ছিল নয়, আছে বলো ।"

"হ্যাঁ আছে ।"

"এক নম্বর ইচ্ছে কী ?"

"অনেক লেখাপড়া শিখে বড় হব, নিজেকে অন্যের থেকে আলাদা মনে করব না ।"

"দু-নম্বর ইচ্ছে ?"

"মানুষকে ভালবাসব, কাউকে হিংসে করব না, কাউকে ছোট চোখে দেখব না ।"

"আমার শেষ ইচ্ছেটা এবার বলো ?"

"বড় হয়ে মানুষকে শিক্ষা দেব, তার কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা করব না ।"

"আমার ইচ্ছেগুলো মুখস্থ করে রেখেছ দেখছি ।"

"মুখস্থ নয়, মনে রেখেছি ।"

"শুধুই মনে রাখা ?"

"না, তোমার ইচ্ছেগুলো আমার জীবনে পূরণ হবে, আমার জীবনে, হ্যাঁ, আমার জীবনে এই ফুলগুলোর মতো ফুটে উঠবে ।" টুটু আঙুল দিয়ে রঙ-বেরঙের ফুলগুলো দেখিয়ে দিল । তারপর সে নিজেই তাজ্জব হয়ে গেল । খানিকটা খুশিও । কীভাবে সে এত গুছিয়ে বলতে পারল, বুঝতে পারল না ।

"তা হলে আমাকে তুমি রাখতে পারবে ?"

"হ্যাঁ, দেখো তুমি, আমি ঠিক পারব ।"

"যতদিন আমার ইচ্ছেগুলো তোমার মধ্যে জেগে থাকবে ততদিন আমিও থাকব ।"

"তা না হলে ?"

"আমি হারিয়ে যাব ।"

"না, না, তুমি চিরকাল থাকবে, দাদুভাই, তুমি কখনও হারাবে না ।"

"তা হলে এবার তৈরি হও । তিনটি ইচ্ছেকে সামনে রেখে এগিয়ে যাও ।"

"তোমার ইচ্ছেই আমার ইচ্ছে ।"

"খুব ভাল কথা, কিন্তু কথা আর কাজ এক হওয়া দরকার । আমি অপেক্ষা করে আছি ।"

"তুমি কোথায় অপেক্ষা করে আছ দাদুভাই ?"

"সবখানে ।"

"আমি তো দেখতে পাই না ।"

"আমি পাই । ভাল থেকো । আমি এবার যাই ।"

"না না, দাদুভাই, তুমি যেও না । তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকো ।"

দাদুভাই তার কথা শুনলেন না । আলো ছড়িয়ে আবার চলে গেলেন ।আস্তে আস্তে বহু দূরে গিয়ে মিলিয়ে গেলেন। টুটু চিৎকার করে ডাকল, "দাদুভাই ।"

দাদুভাইকে আর দেখা গেল না । ক্ষীণ একটা স্বর ভেসে এল দূর থেকে । টুটু শুনল, দাদুভাই বলছেন, "আমি আছি ।"

ঘুম ভেঙে গেল টুটুর । চোখে জল । সে কোথায় ? চারদিকে তাকিয়ে দ্যাখে সে এ তো তাদেরই শোবার ঘর । সে শুয়ে আছে বাবা-মা'র মাঝখানে । কিছুক্ষণ পর ঘরের আলোটা বেশ উজ্জ্বল মনে হল । নিঃশব্দে উঠে বসল টুটু । চোখ মেলে তাকাল দাদুভাইয়ের ছবিটার দিকে । সেই হাসি । টুটু মনে মনে বলল : আমার মনে আছে, দাদুভাই, আমার মনে থাকবে । তোমার ইচ্ছা পূরণ হবে ।

ছবি : দেবাশিস দেব

বিখ্যাত লেখক মার্ক টোয়েন বলেছিলেন, "দয়ার ভাষা অন্যরকম । সে-ভাষা এমনই যে, বধির তা শুনতে পায় এবং অন্ধ সে-ভাষা পড়তে পারে ।"

বিভ্রাট গোপাল লাহিড়ী

লোকটা উঁচু-নিচু জমির উপর দিয়ে নেমে এল। গ্র্যানিট পাথরের চাঁইগুলোর সামনে এসে একপলক আমাকে দেখল। ক্লাইনোমিটার পাথরের ওপর নামিয়ে রেখে লোকটার আপাদমস্তক লক্ষ করলাম। স্থানীয় লোক, চল্লিশ পেরনো বয়স। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। কপালে বয়সের রেখা, গায়ে আধ-ময়লা শার্ট, পরনে খাটো ধুতি। মুখচোখ রুক্ষ, কঠিন। কী চায় লোকটা?

লোকটা আরও কাছে সরে এসে কোনও দ্বিধা না করেই বলল, "ম্যায়, শাঁওনা হুঁ। মুঝকো প্যাটেল-সাবনে আপকো পাস ভেজ দিয়া। আপকো এক হেল্পার কা জরুরত থা, ইস লিয়ে ম্যায় আয়া হুঁ।"

ঘড়ি দেখলাম, বিকেল হয়ে এসেছে। সময় অল্প। চারপাশ অজানা অচেনা। আজই এই এলাকায় প্রথম ফিল্ড ওয়ার্কে বেরিয়েছি। বললাম, "আজ থাক শাঁওনা।"

শাঁওনা আমার কথা শুনল না। হ্যাভার স্যাক, জলের বোতল, গরম জামা, সব তাড়াতাড়ি কাঁধে তুলে নিল। বলল, "চলিয়ে মালিক। আপকো বহুত আচ্ছা পাত্থর দিখায় গা। ইতনা বড়া সফেদ কালা বেহ্‌তার পাথ্‌থর। বিলকুল নজদিক মে। চলিয়ে না মেরা সাথ।"

শাঁওনাকে বোঝালাম, "খুব দেরি হয়ে যাবে শাঁওনা। আমাকে আবার হসপিটাল রোডে ফিরতে হবে। কাল তুমি সকাল সকাল আমার ক্যাম্পে চলে এসো। একসঙ্গে যাওয়া যাবে।"

শাঁওনা কিছুই মানবে না, "নেহি মালিক। আপ ঘাবড়াইয়ে মাত্‌। হাম আপকো ক্যাম্প মে পৌঁছা দেগা। ইধার এক মাইন ভি হ্যায়। ম্যাগনেটাইট মাইন।"

অবাক হলাম। শাঁওনা পাথরের নামও জানে তবে। আশ্বস্ত হওয়া গেল। শাঁওনা সঙ্গে থাকলে কাজেরও সুবিধে হবে। স্থানীয় লোক। বলছে যখন ঘুরেই আসি তবে। "চলো তবে, দেখে আসি তোমার সেই মাইন।"

শাঁওনার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, খুব খুশি, "পাত্থর বিজলি কা মাফিক ঝকমকাতা।" রেললাইনের পাশের অসমান জমি ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। আগে আগে শাঁওনা। বাঁ দিকে বেশ খানিকটা দূরে কোয়েল নদী। সরু আঙুলের মতো জলের রেখা। চতুর্দিকে বালি ছড়ানো। বড়-বড় ঘাসের জমি এদিকে। চলতে কষ্ট হচ্ছে। লুকনো পাথরে পা হড়কে যাচ্ছে। রোদ শেষ। অড়হরের খেতে গোলাপি আভা রয়েছে মাত্র, ছোট-ছোট টিলার ওপরে একদল ছাগল চরছে।

এদিকে এখন আর গ্র্যানিট পাথর পাওয়া যাচ্ছে না। কালচে পাথর এসে পড়েছে। টোপোশিটটা খুললাম। বেলওয়াটিকার থেকে অনেক দূর চলে এসেছি। ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে যাবে। সামনে বরকাখানা লুপ লাইন, শাঁওনা হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, "মালিক, উ নকশা? দিখাইয়ে না।"

ম্যাপটা হাতে নিল শাঁওনা। খুব মনোযোগ দিয়ে দেখল, তারপর আবার ফেরত দিয়ে দিল। চোখেমুখে চাপা উত্তেজনা। বলল, "বহু দামি নকশা, না মালিক?"

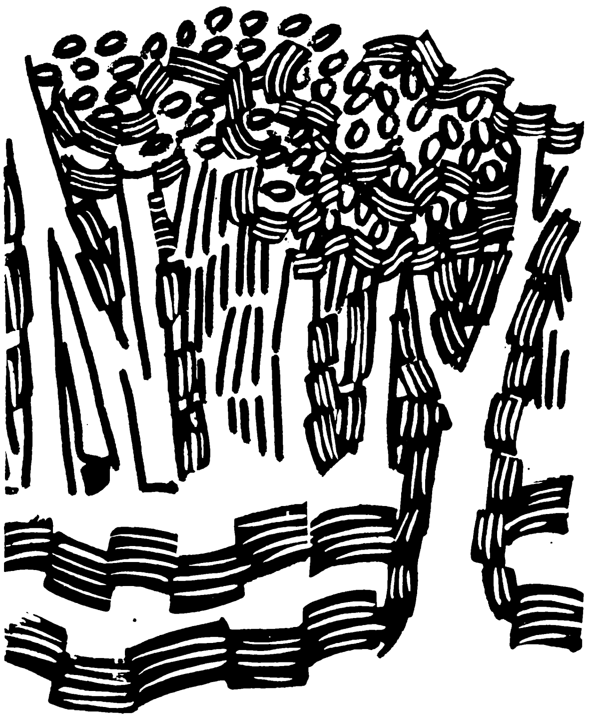

"এই নকশা না হলে আমরা কোনও কাজই করতে পারব না।" শাঁওনা আমার মুখের দিকে তাকাল। মুখে হাসি।

বরকাখানা লুপের তলায় চলে এলাম আমরা। কাছেই একটা নালা। একদল দেহাতি ছেলেমেয়ে জল ছেঁকে-ছেঁকে মাছ ধরছে। নালার ওপাশে বেশ কয়েকটা আমলকী গাছ। গাছে থোকা থোকা আমলকী। ছেলেমেয়েগুলো অবাক চোখে দেখছে। শাঁওনা ওদের সঙ্গে কী যেন কথা বলল। কাছে যেতে একটি মেয়ে এক থোকা আমলকী দিল। খুব মিষ্টি স্বাদ।

রেলব্রিজের তলায় অজস্র গ্র্যানিট পাথর ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। চারপাশ গমগম করছে। চমকে উঠলাম। ট্রেন আসছে গোমোর দিক থেকে। পিলারগুলো কাঁপছে। সেই প্রচণ্ড শব্দের মধ্যেই শাঁওনা চিৎকার করে বলল, "ইধার, সোনা-চাঁদি মিলেগা মালিক?"

কৌতুকের গলায় বললাম, "জরুর।" শাঁওনার চোখদুটো জ্বলে উঠল। আনমনে বিড়বিড় করে কী যেন বলল। রেলব্রিজ পেরোতে-পেরোতে বিকেল শেষ। আকাশে গোধূলি জড়িয়ে আছে। শাঁওনা যেন আর দাঁড়াতেই চাইছে না। হনহন করে এগিয়ে চলেছে কোনওদিকে না তাকিয়ে।

মিস্টার প্যাটেলের কথা মনে পড়ল, 'সাবধানে চলাফেরা করবেন। জায়গাটা মোটেই ভাল না। বুঝতেই পারছেন ট্যুরিস্ট সেন্টার, তার ওপর জঙ্গলের বেআইনি কাঠের ব্যবসা। পয়সা এখানকার লোকজন খুব ভাল চেনে।' আমার সঙ্গে দামি ক্যামেরা, ঘড়ি, ক্লাইনোমিটার কম্পাস। শাঁওনা লোকটার কী মতলব, কে জানে! মাত্র কয়েক ঘন্টার আলাপ। পাথর দেখাবার নাম করে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কে জানে! চারপাশে গাছপালা, জঙ্গল, লোকজনের চিহ্নমাত্র নেই। আর এগনো ঠিক হবে না, এর মধ্যে ঘন কুয়াশা জমেছে। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। শাঁওনাকে ডেকে বললাম, "আজ আর যাব না। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। কাল বরং সকালে এদিকেই প্রথমে আসব।

দেখব তোমার সেইসব সাদা-কালো পাথর, ম্যাগনেটাইট মাইন।”

কথাগুলো শাঁওনার মনে ধরেনি। দু'মুহূর্ত আমার মুখের দিকে তাকাল, “আজ নেহি যায়েগা ?”

বললাম, “না।”

গম্ভীর হয়ে গেল শাঁওনা। একটা পাথরের ওপর বসে বিশ্রাম নিল কিছুক্ষণ। আমিও বসে পড়লাম একটা পাথরে। একসময় উঠে পড়ল ও। গম্ভীর গলায় বলল, “আপ কা জো মর্জি। ঠিক হ্যায় মালিক।”

আমি উঠে ম্যাপটা শাঁওনার হাতে দিলাম। বোঝালাম কতটা পথ এখন আমাদের ফিরতে হবে। শাঁওনা কিছু বলল না। ম্যাপটা হাতে নিয়ে ফিরতে শুরু করল।

ফেরার পথে শাঁওনা শর্টকাট করল। ছাড়া-ছাড়া গাছপালার জঙ্গল, মাঠ পেরিয়ে বেলওয়াটিকারের কাছে এলাম যখন, তখন সন্ধে হয়ে গেছে। দূরে ডালটনগঞ্জ স্টেশনের আলো দেখা যাচ্ছে। রেললাইনের পাশে প্যাটেলের গোডাউন। কুয়াশায় পথ-ঘাট অস্পষ্ট ধোঁয়াটে। শাঁওনা এখন চুপচাপ। কোথা থেকে দেহাতিদের গান ভেসে আসছে।

শহরের কাছে আসতেই রিক্‌শ পেয়ে গেলাম। শাঁওনাকে টাকা দিলাম। সঙ্গে বখশিশও। ও খুশি হল। সেলাম জানিয়ে হেসে চলে গেল। বলে গেল কাল সকাল ন'টার মধ্যেই আমার ক্যাম্পে চলে আসবে।

বেলওয়াটিকারে প্যাটেলের বাংলোর কাছে আসতেই আমার হঠাৎ খেয়াল হল টোপোশিটটা নেই। গেল কোথায় তবে ? রিক্‌শ থামিয়ে রাস্তার এধার-ওধার খুঁজলাম। কোথাও নেই। আমার ব্যাগ তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। পাওয়া গেল না। সর্বনাশ। শাঁওনার বাড়ি আমি চিনি না। ওর হাতেই তো ছিল ম্যাপটা। তবে কি ও দেয়নি আমায় ম্যাপটা ? কাল যদি আর না আসে ? এই অন্ধকারে এখন কোথায় খুঁজব। আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না।

প্যাটেলের বাংলোতে গেলাম, এখানে একমাত্র প্যাটেলই আমার চেনাজানা লোক, ভেবেছিলাম শাঁওনা ওর ফায়ার-ক্লে মাইনেরই কোনও লোক হবে। বললাম সব কথা প্যাটেলকে। উনি বিস্ময়ে ফেটে পড়লেন, “শাঁওনা ? কে বলুন তো ? আমি তো কাউকে পাঠাইনি আপনার কাছে, তবে আমার কাছে কত লোকজন আসে রোজ, না, মনে পড়ছে না তো।”

বজ্রাঘাত এর চেয়ে ঢের ভাল। ম্যাপ হারিয়ে যাওয়া মানে প্রোজেক্টের সমস্ত কাজ বন্ধ। একটা কপিও সঙ্গে নেই। আছে শুধু নেগেটিভ। এখানে পজিটিভ প্রিন্ট করা যাবে না, গত পরশু মাত্র এসেছি। এক্ষুনি ফিরে যাব ? সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

“আপনাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম। আপনি তবু শুনলেন না। শহরটা তো আর ছোট নয়। কোথায় পাব এখন ? চলুন, দেখি কী করা যায়। পুলিশকে অন্তত জানানো দরকার। জানেন, আগে জায়গাটা এমন ছিল না। এখন চোর ডাকাতে ভরে যাচ্ছে।”

মিঃ প্যাটেল একসময় দীর্ঘদিন কলকাতায় ছিলেন। বাংলা জানেন। খুবই উপকারী, অমায়িক মানুষ। ওঁকে বিরক্ত করতে খারাপ লাগছিল, কিন্তু এখন কিছুই করার নেই। চারপাশে খোঁজ-খবর নেওয়া হল। কিন্তু কেউ তেমন হদিস দিতে পারল না। শেষে একজন বলল যে, সে শাঁওনাকে চেনে, লোহার গুদামের পাশে একটা ঝুপড়িতে থাকে।

শাঁওনা ঘরে ছিল। আমাকে দেখে অবাক হওয়ার ভান করল, “আরে মালিক, আপ, ইধার আ গিয়া ? কুছ হুয়া ?”

রাগে গা-হাত-পা কাঁপছে। কিছু জানে না যেন। চোর একটা।

প্যাটেল বললেন, “ম্যাপ কোথায় বার করো। আমি তোমায় পাঠিয়েছিলাম। মিথ্যুক। এক্ষুনি পুলিশ ডাকব।”

শাঁওনা বিস্ময়ে ফেটে পড়ল, “নকশা ! উ তো হাম মালিককো দে দিয়া। প্যাটেল-সাব,আপ তো রহিমকো বোলা থা।”

প্যাটেল রেগে উঠলেন, “রহিমকে বলেছিলাম আর তুমি চলে গেলে। পাজি, তোমায় মজা দেখাচ্ছি।”

আমি বললাম, “তুমি আমাকে ম্যাপ দাওনি, আমার কাছে নেই ম্যাপ। তোমার হাতে ছিল। তুমি নিয়েছ ম্যাপ। বার করো এক্ষুনি।”

“নেহি মালিক। হাম কুছ লিয়া নেহি, উ নকশা আপকো হাম রাস্তাপর দে দিয়া। মেরা পাস কুছ নেহি হ্যায়। ভগবান কি কসম, হাম চোরি নেহি কিয়া।” কান্নায় গলা ডুবে গেল শাঁওনার। ওর বউও বেরিয়ে এসে কান্না জুড়ে দিল।

প্যাটেল পুলিশের ভয় দেখালেন। শাঁওনা বার বার বলতে লাগল, “হাম চোরি নেহি কিয়া। ভগবান কি কসম মালিক, মুঝকো ছোড় দিজিয়ে, গরিব বুদ্ধু আদমি, একদম মর যায়গা।”

বোঝা গেল ও ম্যাপ আর পাওয়া যাবে না। প্যাটেল বললেন, “কী আর হবে, ছেড়ে দিন ওকে। বলছে যখন এত করে মনে হয় ও নেয়নি, রাস্তায় কোথাও পড়ে গেছে। কেউ তুলে নিয়ে গেছে। কাল সকালে একবার তল্লাশ চালানো যেতে পারে।”

কী আর করা ! বললাম, “চলুন, ফিরেই যাই।”

শাঁওনার বছর-পাঁচেকের ছেলে ঘরের দরজা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। বউটা কেঁদে-কেঁদে চোখ-মুখ ফুলিয়ে ফেলেছে। শাঁওনার একই অবস্থা। হঠাৎ আমার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। ঘরের ভেতর ঠাকুরের পটের পিছনে কী উঁকি দিচ্ছে ওটা ! টোপোশিটের অংশটা না ? মনে পড়ল শাঁওনার ঝকঝকে চোখ দুটো, “ইধার সোনা-চাঁদি মিলেগা, না মালিক ?”

এই প্রথম আমার শাঁওনার মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া হল। কপালের বলিরেখা যেন এই ক'ঘণ্টায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। মুখচোখ শুকনো মলিন, ছেলেটার গায়ে জামা নেই, বউয়ের কাপড় শতচ্ছিন্ন। করুণ চোখে শাঁওনা তাকাচ্ছে আর গোঙাচ্ছে, “হাম চোরি নেহি কিয়া মালিক। মুঝকো ছোড় দিজিয়ে মালিক।” টোপোশিটে বড়জোর রাস্তাঘাট পাহাড় নদীর খবর মিলতে পারে, সোনা-চাঁদির হদিস তো আর থাকে না। এই কথা এখন শাঁওনাকে কে বোঝাবে। ওর বিশ্বাস ভাঙাতে ইচ্ছে করল না। থাক তবে ওই টোপোশিট। আমি আর দাঁড়ালাম না, প্যাটেলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। কালকেই কলকাতায় টেলিগ্রাম করতে হবে ম্যাপের কপি পাঠানোর জন্যে।

ছবি : প্রবীর সেন

পাঁচ-দশ্‌কে পঞ্চাশ

মুস্তাফা নাশাদ

টুম্পা আজ দারুণ খুশি। পাঁচের নামতা তার মুখস্থ হয়েছে! খুশি হবারই কথা। ক'দিন ধরে খুবই হেনস্থা হচ্ছিল সে। কী স্কুলে, কী ঘরে। কিছুতেই আর নামতাটা মনে ধরে রাখতে পারছিল না। যতবারই চেষ্টা করেছে, ততবারই পিছলে বেরিয়ে গেছে মন থেকে। নামতা তো না, যেন পাঁকাল মাছ!

টুম্পাকে কম বেগ পেতে হয়নি নামতাটা মুখস্থ করতে। নাওয়া-খাওয়া ভুলে উঠেপড়ে লেগেছিল। নামতা মুখস্থ করতে পারলেই কেল্লাফতে। বাবা অ্যালুমিনিয়ামের স্যুটকেস দেবেন। আর দাদু কলকাতায় বেবিপিসির বাড়ি নিয়ে যাবেন। তবে শর্ত ওই একটাই। যদি নামতাটা মুখস্থ করতে পারে সে, তবেই!

তাই আজ টুম্পা দারুণ খুশি। এত দিনে নামতাটা পুরোপুরি মুখস্থ করতে পেরেছে সে। এরই মধ্যে দাদুকে কয়েকবার শোনানোও হয়ে গেছে। শুধু কি দাদু, বাড়ির যাকেই ধারেকাছে পাচ্ছে, তাকেই পাঁচের নামতাটা শোনাচ্ছে। পাঁচ এক্কে পাঁচ। পাঁচ-দুগুনে দশ! তিন-পাঁচে পনেরো।...

সবাই মন দিয়ে তার নামতা শুনছে আর বাহবা দিচ্ছে। যারাই শুনছে তারাই অবাক হচ্ছে। কী করে আজ অসাধ্য সাধন করল সে? সবাই যখন ধরেই নিয়েছিল যে, টুম্পা কোনওদিনই পাঁচের নামতা মুখস্থ করতে পারবে না, ঠিক তখনই সে সবাইকে পাঁচের নামতা শুনিয়ে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে।

টুম্পা বাবার ফেরার পথ চেয়ে ঘরবার করতে শুরু করল। বাবাকে শোনালেই তার কাজ শেষ। সবাইকে ইতিমধ্যেই কয়েকবার করে শোনানো হয়ে গেছে। বাবাকে না শোনানো পর্যন্ত তার স্বস্তি হচ্ছে না।

বাবাও যেন কেমন! আজকেই বাড়ি ফিরতে এত দেরি করছেন। অন্য দিন তো ঠিক ছ'টা বাজলেই ফিরে আসেন। অনেকে তাঁকে দেখলে ঘড়ির সময়ও মিলিয়ে নেয়। তাঁর ফেরা মানেই সন্ধে ছ'টা! এক মিনিটও এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই। ঝড় উঠুক, বাজ পড়ুক, তাতে কিছু এসে যায় না। গির্জার পেটা ঘড়িটায় ঢং ঢং করে ছ'টা বাজবে, আর টুম্পার বাবাও অমনি বাড়ি ফিরবেন। সেই বাবাই আজ বাড়ি ফিরতে এত দেরি করছেন!

টুম্পার বাবা যখন বাড়ি ফিরলেন, তখন সন্ধে উতরে গেছে। রাত্রির গাঢ় অন্ধকার চারদিকে ছড়াতে ছিটোতে শুরু করেছে। স্কুলের আজ প্রতিষ্ঠা দিবস ছিল। তাই বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হল তাঁর।

বাবা যখন জামাকাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে চা ও খবরের কাগজ নিয়ে বসলেন, টুম্পা তখন গুটি-গুটি পায়ে বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর বাবাকে গড়গড় করে পাঁচের নামতা শুনিয়ে দারুণ চমকে দিল। বাবা শুনে খুশি হয়ে বললেন, "আগামী কাল তো রোববার। দোকানপাট বিশেষ একটা খোলা থাকবে না। পরশু তোমার স্যুটকেস নিশ্চয়ই এনে দেব।"

"আচ্ছা," টুম্পা তারপর বাবার গলা জড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "দাদুর সঙ্গে কাল বেবিপিসির বাড়ি যাব বাবা?"

"বেশ তো, যেও," বাবা টুম্পার মাথায় হাত বুলিয়ে সম্মতি দিলেন।

পরদিন সকালে টুম্পা দাদুর সঙ্গে রওনা হল কলকাতার পথে। পারানি নৌকো করে চুর্নি নদী পার হয়ে আড়ংঘাটায় এসে বার্নপুর লোকাল ধরল। গাড়ি কু-ঝিক-ঝিক করতে করতে এগিয়ে চলল রানাঘাটের দিকে। এই প্রথম টুম্পা ট্রেনে চেপে এত দূরে যাচ্ছে। জানলার ধারে বসে অবাক বিস্ময়ে দেখছে, ট্রেন আসতে দেখে গাছপালা, গোরু-ছাগল, দোকানঘর, সব ভয়ে পিছন দিকে সরে যাচ্ছে, পালাচ্ছে।

গাড়ি ধোঁয়া ও কয়লার গুঁড়ো ওগরাতে ওগরাতে রানাঘাট স্টেশনে এসে থামল। জানলার ধারে বসার জন্যে টুম্পার চোখেও কয়লার গুঁড়ো পড়ল। চোখ রগড়ে রগড়ে জবা ফুলের মতো দুই চোখ রাঙা হয়েছে তার। দাদু রুমাল দিয়ে তার চোখ পরিষ্কার করে দিলেন। তারপর রুমালে ফুঁ দিয়ে চোখে একটু সেঁক দিলেন। টুম্পা বেশ আরাম বোধ করল।

রানাঘাট স্টেশন থেকে ছেলেদের একটা দল হৈ-হৈ করতে করতে তাদেরই কম্পার্টমেন্টে উঠল। দুষ্টুবুদ্ধির ছাপ প্রত্যেকের চোখেমুখে স্পষ্ট। তারা উলটো দিকের সিটে জানলার ধারে গিয়ে বসল। দাদু তাদের দেখে ভুরু কোঁচকালেন। কেন ? টুম্পা তা কিছুতেই বুঝতে পারল না।

গাড়ি আবার কু-ঝিক-ঝিক করে নৈহাটির দিকে বাতাসে ধোঁয়া ছড়াতে ছড়াতে ছুটে চলল। একটার পর একটা স্টেশন আসছে। আবার পিছন দিকে সরে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে পায়রাডাঙ্গা, শিমুরালি, মদনপুর এল এবং গেলও। প্রত্যেক স্টেশনেই গাড়ি থামার সঙ্গে-সঙ্গে কিছু-কিছু লোকজন উঠছে, নামছে। টুম্পাদের কম্পার্টমেন্টে কিন্তু বিশেষ আর কেউ উঠল না।

দাদু ওই ছেলে-পাঁচটির দিকে মাঝে-মাঝে আড় চোখে তাকাচ্ছেন আর আপন মনে বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন। ছেলেগুলোকে যে দাদু মোটেই পছন্দ করছেন না এবং ভাল চোখে দেখছেন না, তা বুঝতে টুম্পার আর বাকি রইল না। কিন্তু কেন যে ওদের দেখে এত বিচলিত হচ্ছেন তিনি, তা সে কিছুতেই বুঝতে পারল না ! হঠাৎ ওদের মধ্যে থেকে একজন অন্য চারজনের উদ্দেশে বলল, "সাধন, দ্যাখ, রেল কোম্পানি লিখেছে যে, বিনা কারণে শিকল টানলে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা। অনাদায়ে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড। এটা কি সত্যি ?"

"সত্যি কি মিথ্যে তা পরখ করে দেখলেই তো পারিস," সাধন হাসতে হাসতে জবাব দিল।

"ঠিক বলেছিস। তা হলে আজই পরখ করা যাক," ভরত সকৌতুকে বলল, "দশ টাকা করে প্রত্যেকে জমা রাখ আমার কাছে। তারপর আমি চেন টানছি। গার্ড যদি ধরে, তা হলে এই পঞ্চাশ টাকা জরিমানা বাবদ দিয়ে দেব।"

যেমন কথা তেমনি কাজ। প্রত্যেকে দশ টাকা করে তার কাছে জমা রাখল। গাড়ি তখন সবে কল্যাণী ছাড়িয়ে নৈহাটির দিকে ছুটতে শুরু করেছে। গাড়ির তখন সে কী গতি। গাছপালা সব সাঁই-সাঁই করে পিছন দিকে সরে যাচ্ছে। এমন সময় ভরত নামের সেই ছেলেটি চেন টানার জন্যে উঠে দাঁড়াল। তাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে দাদু কেন জানি না ভয়ে শিউরে উঠলেন। তাঁর চোখেমুখে অজানা এক আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠল।

"শিকল টানিস না রে," সাধন তাকে বাধা দিয়ে কী যেন চিন্তা করে বলল।

"কেন রে," ভরত তার কথা শুনে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"জরিমানা গুনতেই তো সব টাকা চলে যাবে। মহেশে গিয়ে রথ দেখা আর বেড়ানো হবে না। সেটা একবারও কি ভেবে দেখেছিস," সাধন বুঝিয়ে বলল।

"তুই একটা গবেট," ভরত হাসতে হাসতে বলল, "তা কি আর ভাবিনি রে ?"

"তার মানে," ভরতের কথার হেঁয়ালি না বুঝতে পেরে সাধন ফের জিজ্ঞেস করল।

"ওরে ঘটিরাম," ভরত এবার তার ছকা প্ল্যানটা বন্ধুদের খুলে বলল, "গার্ডমশাই উঠেই তো আর জরিমানা করবেন না। তিনি প্রথমে জিজ্ঞেস করবেন, কে চেন টেনেছে ? তখন...তখন ওই দাদুকে দেখিয়ে দিলেই হবে।"

কী মারাত্মক ছেলে রে বাবা। দাদু ভাবলেন। এ যে বিচ্ছু নয়, একেবারে বাঘ। হঠাৎ ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে চায়। এর হাত থেকে বাঁচা যায় কী করে ? দাদু তাই ভাবতে শুরু করলেন। এতক্ষণে টুম্পার কাছেও জিনিসটা জলের মতো পরিষ্কার হল। সে এবার ভাল ভাবেই বুঝতে পারল, কেন দাদু তাদের ভাল মনে করছিলেন না। কিন্তু এখন কী হবে ? দাদু বিপদ আঁচ করে ঘামতে শুরু করলেন। আর ভরত উঠেই ঘ্যাঁচ করে চেন টেনে দিল।

গাড়ির ছোটার ছেদ পড়ল। ক্যাঁচ ক্যাঁচ করতে করতে গাড়ি থামতে শুরু করল। অবশেষে হালিশহর ও নৈহাটির মধ্যিখানে পৌঁছে গাড়ি থামল। নট নড়ন-চড়ন অবস্থা। গার্ডমশাই ব্যস্তসমস্ত হয়ে গাড়ি থেকে নামলেন। তারপর হন্তদন্ত হয়ে প্রত্যেকটি কম্পার্টমেন্ট চেক করতে শুরু করলেন। কোন্ কামরা থেকে শিকল টানা হয়েছে জানার জন্যে।

একটার পর একটা কামরা পরীক্ষা করতে করতে টুম্পাদের কামরার কাছে এসে থামলেন তিনি। দেখলেন এই কামরা থেকেই শিকল টানা হয়েছে। টুম্পাদের কম্পার্টমেন্টে উঠেই দারুণ রেগে জিজ্ঞেস করলেন, "কে চেন টেনেছেন ? কেন টেনেছেন ?"

গার্ডের কথা শুনে দাদুর তো ভিরমি খাবার মতো অবস্থা হল। চোখে সর্ষেফুল দেখতে শুরু করলেন তিনি। কারণ, এর পর কী যে ঘটবে তা তাঁর আগেই জানা হয়ে গেছে। তিনি দরদর করে ঘামতে শুরু করলেন। পকেটে মাত্র ত্রিশটা টাকা। তা দিয়ে তো জরিমানার টাকা গোনা যাবে না। তা হলে ? দাদু আর ভাবতে পারেন না। তিনি চোখ বুজে এক মনে তখন ভগবানকে ডাকতে শুরু করলেন।

ছেলেগুলোর মুখ খোলার আগেই টুম্পা মুখ খুলল। নির্ভয়ে বুক ফুলিয়ে বলল, "আমি শিকল টেনেছি।"

"তুমি শিকল টেনেছ," গার্ডমশাই তো টুম্পার কথা শুনে থ। তিনি টুম্পাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত বেশ কয়েকবার ভালভাবে দেখে নিয়ে বললেন, "অকারণে শিকল টানার শাস্তি কি জানো ?"

"জানি," টুম্পা এবার গম্ভীরভাবে জবাব দিল।

"তা হলে কেন শিকল টেনেছ বলো," গার্ডমশাই গলার পর্দা সপ্তমে চড়িয়ে ধমকে জিজ্ঞেস করলেন।

উত্তরে টুম্পা আঙুলের ইশারায় ভরত নামের ছেলেটাকে দেখিয়ে বলল, "ওই ছেলেটা তার দলবল নিয়ে দাদুর কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা ছিনতাই করেছে। তাই আমি শিকল টেনেছি। যদি বিশ্বাস না হয়, ওর পকেট সার্চ করে দেখতে পারেন। পাঁচ-দশকে পঞ্চাশ। দশ টাকার পাঁচটা নোট ছিল আমার দাদুর। ওরা কেড়ে নিয়েছে।"

টুম্পার কথামতো ভরতের পকেট থেকে দশ টাকার পাঁচটা নোট বার হল। আর যায় কোথায়। আসামি বামাল ধরা পড়ে গেছে।

নিজের পাতা ফাঁদে নিজেই যে আজ এ-ভাবে ধরা পড়বে, তা স্বপ্নেও ভাবেনি ভরত।

ছবি : দেবাশিস দেব

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

গোলমাল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : হরিবাবুকে পঞ্চানন্দ জানায়, সে তাঁর স্বর্গত পিতা উদ্ভটবিজ্ঞানী শিবু হালদারের কাছ থেকে আসছে। সে নাকি তাঁর শাকরেদ ছিল। হরিবাবুকে সে একটা পুরনো চাবি দিয়ে বলে, "ঈশান কোণ, তিন ক্রোশ।" হরিবাবুর ছোট ভাই ন্যাড়া কুস্তি শেখে গজ-পালোয়ানের কাছে। আর এক ভাই জরিবাবু শেখেন কালোয়াতি গান। হরিবাবুর দুই ছেলে ঘড়ি ও আংটির খেলা দেখে যে-মহারাজা তাদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলেন, বাসের মধ্যে খুন হয় তাঁর সেক্রেটারি। গজ'র ডেরা চক-সাহেবের পোড়াবাড়িতে ঢুকে যে-লোক মারা যায়, তার লাশ মেলেনি। সেক্রেটারির লাশও বেপাত্তা। মধ্যরাতে শিবুবাবুর ল্যাবরেটরিতে মূল্যবান কিছুর খোঁজে ঢুকেছিল গজ ; তিন অতিকায় মূর্তি তাকে বন্দী করে। চক-সাহেবের বাড়িতে উঁকি মেরে পঞ্চানন্দ যাকে দেখতে পায়, তার ক্ষমতা সীমাহীন। হরিবাবু ছাতে উঠে নীল চাঁদ দেখে কবিতা লেখেন। পঞ্চানন্দ বলে, সেটা উড়ন্ত চাকি। চক-সাহেবের বাড়িতে যাবার পথে সে আক্রান্ত হয়। ঢ্যাঙা আততায়ীকে ঘায়েল করে সেই তিনটে অতিকায় লোক, গজকে যারা আটকে রেখেছে। বিদ্যুতের বেড়া অপসৃত হয়েছে বুঝে এগিয়ে যেতেই কাঁকড়াবিছের কামড় খায় গজ, তারপর খানিক হেঁটে এক জলায় বেহুঁশ পড়ে যায়। জ্ঞান ফিরে পেয়ে পঞ্চানন্দও খানিক এগিয়ে গজ'র খোঁজ পায়। কিন্তু গজ'র ছিপছিপে শরীর ইতিমধ্যে হাতির মতন হয়ে গেছে। উড়ন্ত চাকি দেখে ঘড়ি ও আংটিও বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। চক-সাহেবের বাড়িতে ঢুকে আংটি ঘুম লাগায়। ঘড়ি যে কাঁকড়াবিছেটাকে জুতোর তলায় চেপে ধরে, সেটা যান্ত্রিক। এদিকে আংটি সন্ধান পায় প্রথমে সেই মহারাজার 'মৃত' সেক্রেটারির, পরে স্বয়ং মহারাজার। মহারাজা বলেন, অন্য নক্ষত্র-মণ্ডলের লোকেরা পৃথিবীকে চুরি করতে চায়। হরিবাবু ইতিমধ্যে ল্যাবরেটরিতে একটা গোলকের খোঁজ পেয়েছেন। আর আংটি জেনেছে, মহারাজা আর কেউ নন, ভিন্ন গ্রহের মহাশক্তিধর রামরাহা। তারপর...

আংটি আমতা আমতা করে বলল, "কিন্তু আমাদের কাছে তো ওরকম কিছু নেই।"

মহারাজ অর্থাৎ রামরাহা একটু হেসে বললেন, "হয়তো আছে, কিন্তু তোমরা জানো না। হয়তো নয়, অবশ্যই আছে। কিন্তু জিনিসটা ঘুমন্ত। ওর ভিতর থেকে সূক্ষ্ম একটা বিকিরণ সব সময়েই ঘটছে। কিন্তু বিকিরণটা এতই সামান্য যে, ধরা মুশকিল। তোমরা যে-বাড়িতে থাকো, তারই কোথাও লুকনো আছে। কিন্তু সেটা খুঁজে দেখার সময় আমি পাইনি। সময় বোধহয় আর পাবও না। এখন আমার হাতে যেটুকু ক্ষমতা আছে সেটুকুই কাজে লাগাতে হবে। চলো, আর সময় নেই।"

এই বলে মহারাজ উঠে পড়লেন।

হরিবাবু যেখানটায় এসে পড়েছেন, সেটা যে একটা জলা তা তাঁর খেয়াল হল পায়ে ঠাণ্ডা লাগায়। এতক্ষণ বেশ ব্রাহ্মমুহূর্তে পবিত্রতার কথা ভাবতে ভাবতে মনটা উড়ু-উড়ু করছিল। কিছু কবিতার লাইনও চলে আসছিল মাথায়।

ত্যাগ করো লোকলজ্জা,
ভোরবেলা ছাড়ো শয্যা,
করো কব্জা ব্রাহ্মমুহূর্তেরে,
ঝরাও ঘর্ম, ধরো কর্ম,
সঙ্গী হবেন পরব্রহ্ম,
এলেন বলে লক্ষ্মী তেড়েফুঁড়ে।

এর পরেও কবিতাটা চলত। কিন্তু ঝপাং করে হাঁটুভর যমঠাণ্ডা জলে আচমকা নেমে পড়লে কোনও কবিরই ভাবটাব থাকে না। হরিবাবুরও তাল কেটে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি। কবির পথে যে কত বাধা তা আর বলে শেষ করা যায় না।

অন্য কেউ হলে জল থেকে হাঁচোড়-পাঁচোড় করে উঠে পড়ত। কিন্তু হরিবাবু সেরকম লোক নন। জলে নেমে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত ঠাণ্ডায় ঝনঝন করে উঠলেও তিনি পিছু হটলেন না। ছেলেবেলায় এই জলায় তিনি কতবার মাছ ধরতে এসেছেন। জলার মাঝখানটা তখন বেশ গভীর ছিল। নিতাই নামে একটা লোকের একখানা ডিঙি নৌকো বাঁধা থাকত ধারে। বহুবার সেই নৌকো বেয়ে জলায় ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। আজ নৌকো নেই, কিন্তু...

কিন্তু জাহাজ আছে!

হরিবাবু খুবই অবাক হয়ে গেলেন। জলার মধ্যে বেশ খানিকটা জলকাদা ভেঙে তিনি আপনমনে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। নিতাইয়ের ডিঙি নৌকোর কথাটা বারবার মনে আসছে। এমন সময় দেখলেন, জলার মধ্যে বাস্তবিকই মস্ত এক জাহাজ। না, একেবারে হুবহু জাহাজের মতো চেহারা নয়। মাস্তুল-টাস্তুল নেই। কেমন একটু লেপাপোঁছা চেহারা। তা হোক, তবু এ যে জাহাজ তাতে সন্দেহ নেই।

বিস্ময়টা বেশিক্ষণ রইল না হরিবাবুর। ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠলে কত কী হয়, কত অসম্ভবই সম্ভব হয়ে ওঠে তার কি কিছু ঠিক আছে! তবে স্বয়ং ব্রহ্মই যে হরিবাবুর মনের ইচ্ছে টের পেয়ে নৌকোর বদলে আস্ত একখানা জাহাজ পাঠিয়ে দিয়েছেন, এ-বিষয়ে তাঁর আর কোনও সন্দেহ রইল না।

হরিবাবু জল ভেঙে যতদূর সম্ভব দ্রুত জাহাজটার দিকে এগোতে লাগলেন।

জাহাজের লোকজন যেন হরিবাবুর জন্যই অপেক্ষা করছিল। করারই তো কথা কিনা। তবে লোকগুলোর চেহারা-ছবি হরিবাবুর বিশেষ পছন্দ হল না। বড্ড বড়সড় আর বেজায় হোঁতকা। সংখ্যায় তারা জনা চার-পাঁচ হবে। হরিবাবু জাহাজটার কাছে হাজির হতেই লোকগুলো হাতের কাজ ফেলে তাঁর দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল। হরিবাবু তাদের দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, "বাঃ, বেশ জাহাজখানা তোমাদের!"

ঠিক এই সময়ে অনেকটা দূর থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, "বাবা, পালিয়ে এসো! ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে।"

হরিবাবু একটু থমকে চারদিকে চাইলেন। গলাটা তাঁর বড় ছেলে ঘড়ির বলে মনে হল। কিন্তু ঘড়ি কেন চেঁচাচ্ছে তা তাঁর মাথায় ঢুকল না।

হরিবাবুও চেঁচিয়ে একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই দু'মন ওজনের একখানা থাবা এসে ক্যাঁক করে তাঁর ঘাড়খানা ধরে এক ঝটকায় শূন্যে তুলে নিল। হরিবাবু চোখে

অন্ধকার দেখলেন।

ভাল করে কিছু বুঝবার আগেই সেই বিশাল হাতখানা একখানা ক্রেনের মতো তাঁকে শূন্যে ভাসিয়ে সেই জাহাজখানার ভিতরে একটা চৌকো বাক্সের মতো ঘরে নিক্ষেপ করল।

হরিবাবুর কিছুক্ষণের জন্য মূর্ছার মতো হয়েছিল। তারপর চোখ মেলে চাইতেই তিনি দেখলেন, তাঁর আশেপাশে আরও বেশ জনাকয় লোক রয়েছে। দু'চারজনকে তিনি চেনেনও। যেমন লোহার কারিগর হরিদাস, পটুয়া বক্রেশ্বর, আতরওয়ালা এক্রাম, হালুইকর গণেশ, রামজাদু স্কুলের বিজ্ঞানের মাস্টার যতীন ঘোষ। আরও অনেকে।

যতীনবাবুই হরিবাবুকে দেখে এগিয়ে এলেন। মুখখানা শুকনো, চোখে আতঙ্ক। বললেন, "এসব কী হচ্ছে মশাই?"

হরিবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "কিছুই বুঝতে পারছি না। মনের ভুলে জলায় নেমে জাহাজ দেখে এগিয়ে এসেছি, অমনি ধরে আনল।"

যতীনবাবু ধরা গলায় বললেন, "আমিও রাতে একটু বাথরুমে গিয়েছিলুম। বাইরে একটা অদ্ভুত আলো দেখে বেরিয়ে আসি। জলায় আলো জ্বলছে দেখে ব্যাপারটা তদন্ত করতে এসে পড়েছিলুম। তারপর এই তো দেখছেন।"

"এরা সব কারা?"

"মানুষ নয়। ভূত যদি বা হয় তবে বেশ শক্ত ভূত। সেই কখন থেকে নাগাড়ে রাম-নাম করে যাচ্ছি, কোনও কাজই হচ্ছে না।"

হরিবাবু চারদিকে চেয়ে দেখলেন। ঘরখানায় দেখার অবশ্য কিছু নেই। লোহার মতোই শক্ত কোনও ধাতু দিয়ে তৈরি মসৃণ দেয়াল। ছাদখানা বেশ নিচু। তাতে কয়েকটা অদ্ভুত রকমের আলো জ্বলছে। ঘরের মেঝেখানাও ধাতুর তৈরি। তবে ঘরখানা বেশ গরম। বাইরের ঠাণ্ডা মোটেই টের পাওয়া যাচ্ছে না।

হরিবাবু হঠাৎ যতীনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, জাহাজের সঙ্গে মেলানো যায় এমন কোনও শব্দ মনে পড়ছে?"

"জাহাজ!" বলে যতীনবাবু অবাক হয়ে তাকালেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, "আজ্ঞে না। রাম-নাম ছাড়া আর কোনও শব্দই আমার মাথায় নেই কিনা। কিন্তু, আপনি কি এখনও কবিতার কথা ভাবছেন? এই দুঃসময়ে, এত বিপদের মধ্যেও?"

হরিবাবু একটু লজ্জিত হয়ে বললেন, "কী জানেন, একবার কবি হয়ে জন্মালে আর কবিতা কিছুতেই ছাড়তে চায় ন। শত বিপদ, শত ঝড়ঝঞ্ঝা, এমনকী মৃত্যুর মুখেও কবিতার লাইন গুনগুন করবেই মাথায়। ওয়ানস এ পোয়েট অলওয়েজ এ পোয়েট।"

যতীনবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "তাই তো দেখছি। কিন্তু কবিতা দিয়ে আর কীই-বা করবেন হরিবাবু? পরিস্থিতি যা বুঝছি, এরা সব মহাকাশের জীব। আর এই যেখানে আমরা আটক রয়েছি, এটা একটা মহাকাশযান। আমার মনে হচ্ছে এরা আমাদের ধরে অন্য কোনও গ্রহে নিয়ে যাচ্ছে। সেখানে কবিতার চল আছে কি না কে জানে।"

হরিবাবু একটু ভ্রূ কুঁচকে ভাবলেন। তারপর একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন, "কবিতা নেই এমন গ্রহ কোথাও থাকতে পারে না। দুনিয়াটাই তো কবিতায় ভরা, আমি তো রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট দেখতে পাই, নক্ষত্র থেকে টপটপ করে কবিতা ঝরে পড়ছে জলের ফোঁটার মতো।"

"বটে!" বলে যতীনবাবু আর একবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। মাথা নেড়ে বললেন, "বাস্তবিক আপনি ক্ষণজন্মা পুরুষ।"

হরিবাবু একটু হাসলেন। লোকগুলো ভয়ে সব বোবা মেরে আছে। দু'চারটে ফিসফাস শোনা যাচ্ছে মাত্র। হরিবাবু ওসব গ্রাহ্য করলেন না। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে জাহাজের সঙ্গে কী মেলানো যায় তা গভীরভাবে ভাবতে লাগলেন।

আংটি যখন রামরাহার পিছু-পিছু জলার ধারে এসে দাঁড়াল তখন জলার মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে। কী ঘটছে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু খুব শক্তিশালী একটা যন্ত্রের চাপা শব্দ আসছিল। পায়ের তলার মাটি সেই যন্ত্রের বেগে থিরথির করে কাঁপছে।

রামরাহা বললেন, "ওরা মাটি ফুটো করে ভিতরে চার্জ নামিয়ে দিচ্ছে।"

"চার্জ মানে?"

"এক ধরনের মৃদু বিস্ফোরক। শুধু এখানেই নয়, পৃথিবীর আরও কয়েকটা জায়গায় এরকম কাজ চলছে। চার্জগুলো কার্যকর হলেই পৃথিবী তার কক্ষপথ থেকে ধীরে ধীরে সরে সৌরমণ্ডলের বাইরের দিকে ছুটতে শুরু করবে।"

"কী ভয়ংকর!"

রামরাহা দাঁতে ঠোঁট কামড়ালেন। তাঁর পিঠে একটা রুকস্যাকের মতো ব্যাগ। সেটা ঘাসের ওপর নামিয়ে প্রথমে একটা ক্যালকুলেটারের মতো যন্ত্র বের করে কী যেন দেখতে লাগলেন।

হঠাৎ চমকে উঠে বললেন, "এ কী!"

"কী হয়েছে?"

"সর্বনাশ! আমি যে শক্তির উৎসটার কথা তোমাকে বলছিলাম, এখন দেখছি সেটার সন্ধান বর্বররাই পেয়ে গেছে। এই দ্যাখো।"

মহারাজ ওরফে রামরাহা ক্যালকুলেটরটা আংটির সামনে ধরলেন। আংটি দেখল একটা ছোট্ট ঘষা কাচের পর্দায় একটা মৃদু আলোর রেখায় ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

রামরাহা বললেন, "তোমার দাদু একজন আবিষ্কারক ছিলেন। সম্ভবত কোনও সময়ে তিনি এই অদ্ভুত জিনিসটি আবিষ্কার করেছিলেন। এই জিনিসটির সন্ধানেই বোধহয় বর্বররা এখানে হানা দিয়েছিল। এখন দেখছি, ওরা ওটা পেয়ে গেছে।"

"তা হলে কী হবে?"

রামরাহা কব্জির ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, "আংটি, আমার আর বিশেষ কিছু করার নেই। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পৃথিবী কক্ষচ্যুত হবে। সেই সময়ে আমার পক্ষে এই গ্রহে থাকা ঠিক হবে না। আমি সমুদ্রের তলায় আমার মহাকাশযানে ফিরে যাচ্ছি। পৃথিবীকে ওরা টেনে নেওয়ার আগেই আমাকে চলে যেতে হবে। তবে আমি তোমাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি।" (ক্রমশ)

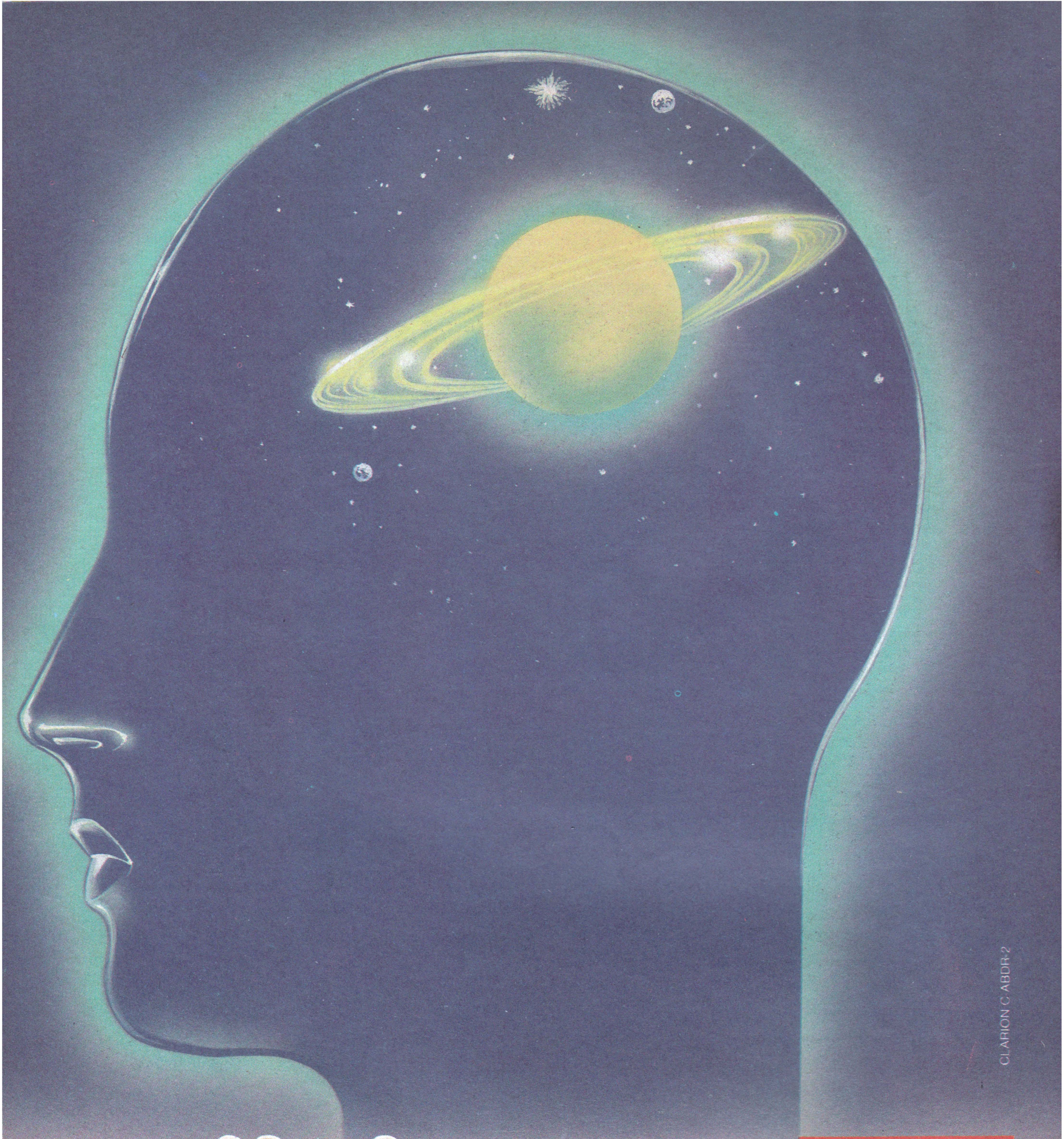

আকাশ-পৃথিবীর অসীম রহস্যের সন্ধানে…

আকাশে কত তারা ? ব্ল্যাক হোল কি ? ‘হ্যালি’র ধুমকেতু কেন প্রতি ৭৫ বছর পর পৃথিবীর দিকে পাড়ি দেয় ? এ সব রহস্যের উত্তর আজ ‘দেশ’-এর পাতায়।
বস্তুতঃ ‘দেশ’-এর ‘বিজ্ঞান প্রসঙ্গ’ পাঠকদের কাছে এক নতুন জগত তুলে ধরেছে। তা সে আকাশের নক্ষত্র মণ্ডলই হোক, কিংবা হঠাৎ জেগে ওঠা আগ্নেয়গিরি। এ ছাড়াও ‘দেশ’-এ রয়েছে অনেক পড়ার ও চিন্তার খোরাক। রাজনীতি, ভ্রমণ, সাহিত্য, খেলাধূলা, সাক্ষাৎকার— যে কোন দিক থেকেই দেখা যাক না কেন ‘দেশ’ এক পূর্ণাঙ্গ পত্রিকা। আর আজ দেশ-এর প্রতিটি সংখ্যায় রয়েছে এক নতুন প্রতিশ্রুতি। এর প্রচ্ছদপটে সমসাময়িক কালের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সার্থক প্রতিফলন। এর অঙ্গসজ্জায় এবং মুদ্রণে ঔজ্জ্বল্য ও সমকালীনতার চিহ্ন। বাস্তবিকই মনের জানালা খুলে দেওয়ার মত পত্রিকা একটিই। ‘দেশ’।

দেশ

চিন্তার জগতে বাঙলার ও বাঙালীর গৌরব

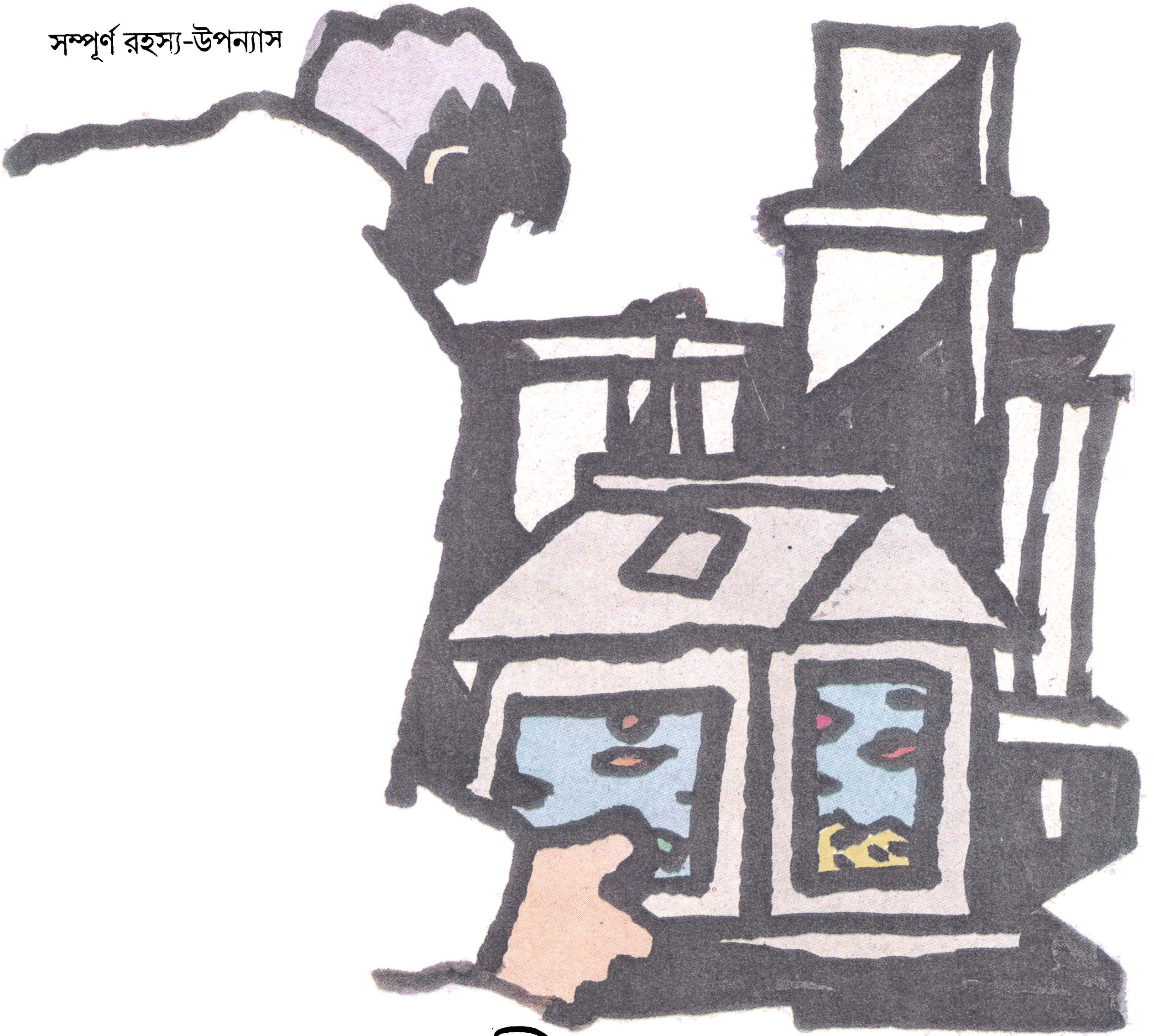

অনুসন্ধানীর রহস্যভেদ

অজেয় রায়

বিকেল প্রায় চারটে। দক্ষিণ কলকাতায় যতীন দাস রোডে একটি বাড়ির সামনে থামল জয়। ছোট দোতলা বাড়ি। দোতলায় ওঠার দরজার পাশে দেয়ালে কাঠের ফলকে লেখা—পুলক রায়, অনুসন্ধানী।

জয় কলিং-বেল টিপল।

দরজা খুলল হরিহর।

পুলকের পড়ার ঘর থেকে ডাক এল, "এসো জয়, এসো। তোমার কথাই ভাবছিলাম। আসছ কোত্থেকে?"

"ন্যাশনাল লাইব্রেরি।"

"এক্ষুনি বেরোতে হবে। যাবে আমার সঙ্গে? সময় আছে?"

"তা আছে। কী ব্যাপার?"

"চুরি। তবে ঠিক কী হয়েছে এখনও কিস্‌সু জানি না। ব্যারিস্টার ব্যানার্জি টেলিফোন করেছিলেন। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে হবে এক্ষুনি। তারপর জানা যাবে পুরো ব্যাপারটা। তবে ব্যানার্জিসাহেব যখন তাগাদা দিয়েছেন ব্যাপার নিশ্চয় ঘোরালো।"

"ভদ্রলোক কে?"

"নাম আর ঠিকানাটা শুধু জেনেছি। নাম বিশ্বনাথ মজুমদার। নিবাস নিকটেই, সদানন্দ রোডে। বয়স্ক, বিপত্নীক। পয়সা আছে। ঠিকেদারি ব্যবসা করতেন। ব্যানার্জিসাহেবের বিশেষ পরিচিত। একজন দক্ষ প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভের খোঁজ চেয়েছেন। ব্যারিস্টার ব্যানার্জি আমার নাম করেছেন। চা খাবে?"

জয় বলল, "না। স্রেফ ঠাণ্ডা কুঁজোর জল। যা গরম, পাঁচ মিনিট জিরিয়ে নিই।"

জয় গা এলিয়ে বসল।

পুলক রায়ের বয়স ত্রিশ ছুঁয়েছে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। পাকা

ছ' ফুট লম্বা। দোহারা বলিষ্ঠ গড়ন। ধারালো মুখ। পরনে হাফ-হাতা শার্ট ও ট্রাউজার্স। কথা বলে ঠাণ্ডা গলায়।

জয়ের বয়স চব্বিশ। লম্বায় পুলকের কাছাকাছি। তবে কিঞ্চিৎ রোগাটে। রঙ ফর্সা। টিকোলো নাক। বড়-বড় চোখ। পরনে পাঞ্জাবি ও পাজামা।

হরিহর জল আনল। এক চুমুকে গ্লাস নিঃশেষ করে, মিনিটখানেক জিরিয়েই খাড়া হল জয়, "চলো পুলকদা।"

কালীঘাটে সদানন্দ রোডে মস্ত এক দোতলা বাড়ির সামনে থামল পুলক ও জয়। "হুঁ, এই বাড়ি," নোটবইয়ে লেখা ঠিকানার সঙ্গে মিলিয়ে জানাল পুলক। গেট ঠেলে ঢুকল দু'জনে। একফালি গাড়িবারান্দা পার হল। তারপর সদর দরজার কলিং-বেল টিপল।

দরজা খুলে গেল, "কাকে চাই?" মাঝবয়সী একটি লোক উঁকি মেরে প্রশ্ন করল। তার গা খালি। খাটো ধুতি পরা। দেখে মনে হয় বাড়ির পরিচারক।

"বিশ্বনাথবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই। শ্রীবিশ্বনাথ মজুমদার। বলবে, ব্যারিস্টার ব্যানার্জি পাঠিয়েছেন," বলল পুলক।

কৌতূহলী চোখে কয়েক পলক আগন্তুকদের নজর করে লোকটি বলল, "বসুন, বাবুকে বলছি।"

বারান্দায় রাখা বেতের চেয়ারে বসল পুলকরা। লোকটি ভিতরে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল সে। ডাকল, "আসুন ওপরে, বাবুর ঘরে।"

প্রথমে বৈঠকখানা। গদিমোড়া দামি সোফাসেট সাজানো। দেয়ালে ফ্রেমে আটকানো বড়-বড় কয়েকটা ছবি। হাতে আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্য। বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে চওড়া বারান্দা। একটু বাঁয়ে হেঁটে ওপরে ওঠার সিঁড়ি। লোকটি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল, পিছনে জয় ও পুলক। বাড়ির আকৃতি সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মতন।

জয় এক নজরে দেখে নিল একতলাটা। সিমেন্ট বাঁধানো চৌকো মস্ত চত্বরের তিন দিক ঘিরে টানা-বারান্দা। বারান্দার লাগোয়া পর-পর ঘর। তাদের দেখে ঘোমটা টেনে সরে গেলেন লাল-পাড় শাড়ি পরা মাঝবয়সী খুব ফর্সা মোটাসোটা এক ভদ্রমহিলা।

সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে পুলক জিজ্ঞেস করল লোকটিকে, "বাবু নীচে নামেন না?"

জবাব হল, "নামেন। আজ নামবেন না। বাতের ব্যথাটা বেড়েছে কিনা, তাই।"

দোতলায় সিঁড়ির মুখ থেকে কোনাকুনি ভাবে দু'ধারে রেলিং দেওয়া বারান্দা চলে গেছে। এই তলাতেও অনেক ঘর। ঘরগুলোর দরজা-জানলার কোনওটার পাল্লা বন্ধ, কোনওটার পর্দা টানা। একটিও মানুষের দর্শন মিলল না। দোতলায় উঠেই, সোজাসুজি বারান্দায় দেয়াল ঘেঁষে টেবিলের ওপর রয়েছে একটা বড় অ্যাকোয়ারিয়াম। আর রেলিংয়ের ধারে-ধারে খানিক তফাতে-তফাতে নিচু টুলের ওপর রাখা সুদৃশ্য চিনেমাটির টবে চারটি চার রকম ক্যাক্টাসগাছ। অ্যাকোয়ারিয়ামের ভিতরে নানান আকারের নুড়িপাথর, বালি ও আঁকাবাঁকা শুভ্র প্রবাল ফসিল। কয়েক জাতের বিচিত্র বর্ণ ও আকৃতির ছোট-ছোট মাছ খেলছে তার জলে। মুগ্ধ চোখে চেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল পুলক। জয় জানে, এককালে পুলকের অ্যাকোয়ারিয়ামের শখ ছিল।

"রঙিন মাছ কে পোষে?" পুলক জিজ্ঞেস করে।

"আজ্ঞে শিববাবু," উত্তর দেয় লোকটি।

"আর ওই গাছ?" ক্যাক্টাসগুলো দেখায় পুলক।

"গাছের শখ বড়দাদাবাবুর। ওধারে বারান্দাতেও আছে কয়েকটা। ওই যে—" লোকটি আঙুল দেখায়।

সিঁড়ি পাক খেয়ে উঠে গেছে ছাদে। সিঁড়ি, বারান্দার মেঝে, দেয়াল ঝকঝকে তকতকে। সব মিলিয়ে এই বাড়ির বাসিন্দাদের সচ্ছল অবস্থা এবং সুরুচির পরিচয় প্রকাশ পাচ্ছে।

পথপ্রদর্শকের পিছু-পিছু সোজা চলেছে পুলকরা। হঠাৎ এক বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে ভেসে এল তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর, "কে, কে?"

চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল পুলক ও জয়। সঙ্গের লোকটি ইঙ্গিত করল, এগিয়ে চলুন। তারপর সে নিচু গলায় বলল, "আজ্ঞে আমি ছোড়দাদু, গোবিন্দ।"

ঘর থেকে ফের প্রশ্ন হল, "ও। তোর সঙ্গে কারা?"

"বড়বাবুর কাছে এয়েছেন," গোবিন্দ নামে লোকটি জবাব দিল। বলতে বলতেই সে এগোয়। এবং পরের পরের ঘরের সামনে থামে। পর্দা ঢাকা দরজার সামনে গিয়ে গোবিন্দ বলল, "বাবু, ওনারা এয়েছেন।"

"ভেতরে নিয়ে আয়," ভারী গলার আওয়াজ ভেসে আসে ঘরের ভিতর থেকে।

গোবিন্দ পুলকদের বলল, "বাবু, জুতো বাইরে খুলে ঢোকেন।"

জুতো খুলে, পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল পুলক ও জয়। দরজার কপাট খোলাই ছিল।

ঘরের মাঝখানে এক পালঙ্ক। মাথার ওপর ঘুরছে ফ্যান। হলুদ-রঙা বেডকভারে ঢাকা বিছানায় একটা গোব্দা তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে আধশোয়া মানুষটিকে দেখে জয় থমকে গেল। শীর্ণ শরীর। শুকনো হর্তুকির মতন মুখখানা। টিয়াপাখির মতো বাঁকা নাক। ঘন পাকা চুল। দাড়ি-গোঁফহীন। সরু গোল পিতলের ফ্রেমে চশমার কাঁচের পিছনে ঈষৎ রক্তাভ দুই চোখে তীব্র চাউনি। গৌরবর্ণ কালের কুঞ্চনে বিবর্ণ। পরনে ধুতি ও সাদা ফতুয়া। বৃদ্ধ খর দৃষ্টিতে পুলক ও জয়কে দেখে নিয়ে খাড়া হয়ে বসলেন।

জয় এক নজর বুলিয়ে নিল ঘরে। ঘরটা বেশ বড়। প্রচুর আসবাব। কয়েকটি কাঠের চেয়ার। একটা স্টিলের আলমারি। দেয়াল-র‍্যাকে অনেক বই ও বাঁধানো পত্রিকা। কোণে একটা টেবিলে কিছু ফাইল এবং কাগজপত্র। একটি আলনায় পাট করা কাপড়, গামছা ইত্যাদি। সবই সাজানোগোছানো। পুবের জানলাটা খোলা, তবে পর্দা টানা।

বৃদ্ধ ধীর স্বরে বললেন, "ব্যানার্জি পাঠিয়েছে?" ওই ক্ষীণ কাঠামোয় কণ্ঠস্বরটি কিন্তু আশ্চর্যরকম ভরাট।

"আজ্ঞে হ্যাঁ," জানাল পুলক।

"উত্তম, বসুন," বিশ্বনাথবাবু দেয়াল ঘেঁষে রাখা চেয়ার দেখালেন। পুলক ও জয় বসল। অতঃপর বিশ্বনাথবাবু গোবিন্দকে বললেন, "তুই এখন যা। বাইরে বারান্দায় থাক। কাউকে এ-ঘরে আসতে দিবিনে। বলবি আমার বারণ আছে। আমি এনাদের সাথে প্রাইভেট কথা বলব। দরজাটা ভেজিয়ে দিস।"

গোবিন্দ মাথা হেলিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিল।

আবার একপ্রস্থ পর্যবেক্ষণ। বিশ্বনাথবাবুর ললাটে কয়েকটি বাড়তি ভাঁজ পড়ে। তিনি পুলকের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ব্যানার্জি বলেছে কিছু ?"

"সামান্যই। শুধু এটা একটা চুরির কেস," পুলকের জবাব।

"হুম্। আপনি পুলক রায়। অনুসন্ধানী। অর্থাৎ প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ ?"

"হ্যাঁ।"

"হুম্, ইয়াংম্যান। অভিজ্ঞতা আছে ?"

পুলক উত্তর দিল না। কেবল একচিলতে নীরব হাসি তার ঠোঁটের কোণে ঝিলিক দিল।

"হঠাৎ এ-লাইনে কেন ?" বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন।

পুলক বলল, "পুলিশের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চে চাকরি করেছি বছরপাঁচেক। এই লাইনে কিছুটা অভিজ্ঞতা হল। তবে চাকরি ভাল লাগল না। ইচ্ছে হল স্বাধীনভাবে কাজ করি।"

"যাক, ব্যানার্জি যখন রেকমেন্ড করেছে, যোগ্য লোকই হবে," বৃদ্ধের স্বগতোক্তি, "ইটি কে ?" বিশ্বনাথবাবুর চোখ এবার জয়ের ওপর।

"ওর নাম জয় দত্ত," জানাল পুলক।

"আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট ? ওয়াটসন বুঝি ?"

পুলকের মুখে হাসি ফোটে। বলে, "হুঁ, তাই হবারই ইচ্ছে বটে।"

"আর কিছু করা হয় ?" বৃদ্ধের প্রশ্ন জয়কে লক্ষ করে।

জবাবটা পুলকই দিল—"আপাতত ও মডার্ন হিস্ট্রিতে এম-এ পাশ করে রিসার্চ করছে।"

"ওকে বিশ্বাস করতে পারি ? ব্যাপারটা যেন গোপন থাকে।"

"তা পারেন," বলল পুলক, "জয় আমার সঙ্গে আরও কেসে সাহায্য করেছে। এ-লাইনের রীতিনীতি জানে।"

"চা'টা কিছু খাবেন ?"

"এখন থাক," বাধা দেয় পুলক।

"হুম্।" বৃদ্ধ মাথা নিচু করে রইলেন অল্পক্ষণ। কী বলবেন গুছিয়ে নিচ্ছেন যেন মনে-মনে।

বিশ্বনাথবাবু মুখ তুলে পুলককে বললেন, "বুঝলে, আমার একটা আংটি চুরি গেছে। এঃ, 'তুমি' বলে ফেললাম, কিছু মনে কোরো না। অবশ্য তোমরা আমার ছেলের বয়সী।"

"না, না, মনে করার কী আছে ? 'তুমি'ই বলুন," পুলক আশ্বাস দেয়, "তারপর ?"

বিশ্বনাথবাবু বলেন, "সোনার আংটি। খুব ভাল একটা হিরে বসানো। আট-দশ হাজার টাকা দাম হবে।"

"কোথায় ছিল ?" পুলক জিজ্ঞেস করে।

"এই ঘরে। ওই আলমারিতে," দেয়ালের গায়ে খাড়া-করা স্টিলের আলমারিটা তিনি আঙুল তুলে দেখালেন। বললেন, "ওই আলমারির সাধারণ চাবি এবং লকারের চাবি দুই-ই ছিল আমার এই বিছানায়, মাথার বালিশের তলায়।"

"কখন চুরি হয়েছে মনে হয় ?" পুলকের প্রশ্ন।

"গতকাল রাতে। রাত ন'টা থেকে ভোর সাতটার মধ্যে। চোর আমার বালিশের নীচে থেকে চাবি বের করে নিয়েছিল।

চুরি করে ফের লকার এবং আলমারি বন্ধ করে চাবি দুটো যথাস্থানে অর্থাৎ আমার বালিশের তলায় রেখে দেয়। তবে ঠিক আগের জায়গায় রাখতে পারেনি, একটু বাইরে ছিল।"

"রাত ন'টা থেকে সকাল সাতটা অবধি কি আপনি ঘুমিয়ে ছিলেন ?" বলল পুলক।

"কারেক্ট," জানালেন বৃদ্ধ।

"এ ঘরে আর কেউ শোয় ?"

"না।"

"ঘরের দরজা খুলল কীভাবে ?"

"কাল রাতে আমার ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। ছিটকিনি দিইনি। আমার হাঁটুতে বাত আছে। ব্যথা বাড়লে ঘরের দরজা রাতে ভেজানো থাকে। কারণ, যন্ত্রণা বেশি হলে গোবিন্দকে ডাকি। ও আমার পা টিপে দেয়, ওষুধ দেয়। জলতেষ্টা পেলে জল দেয়। আমার ঘর থেকে গোবিন্দকে ডাকার জন্য কলিং-বেল আছে। বারবার উঠে দরজার ছিটকিনি খুলতে আমার তখন কষ্ট হয়। গোবিন্দ পাশের ঘরে শোয়, এই বারান্দার শেষ ঘরে। ওই আমার দেখাশোনা করে। কাল অবশ্য ওকে আমার প্রয়োজন হয়নি।"

"কেন ?"

"কারণ, কাল রাতে আমি ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলুম। অমাবস্যা-পূর্ণিমায় আমার হাঁটুর ব্যথাটা খুব বাড়ে। তখন রাতে মোটে ঘুমোতে পারি না। তাই ওইসব রাতে ঘুমের ওষুধ খেতে বাধ্য হই। গতকাল ছিল অমাবস্যা।"

"আপনি যে অমাবস্যা-পূর্ণিমায় ঘুমের ওষুধ খান, এ খবর কে কে জানে বাড়িতে ?"

"অনেকেই জানে, এটা কিছু গোপন ব্যাপার নয়।"

"আলমারিতে আর-কোনও দামি জিনিস ছিল না ?" বলল পুলক।

"ছিল বইকী," বিশ্বনাথবাবু উত্তর দেন, "এর চেয়ে ঢের

রোদের চমক!
আর দাম...
দাম মাত্র এইটুকু
Double Power
SUNLIGHT
DETERGENT
POWDER
For a brighter wash
সানলাইট ডিটারজেন্ট পাউডার আপনার কাপড়ে এনে দেয় এমন রোদের চমক যা, সাধারণ পাউডার দিয়ে কোনোমতেই হওয়া সম্ভব নয় – আর দাম, একেবারেই কম !
সানলাইট
ডিটারজেন্ট পাউডার
হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন
OBM/6801/BEN

ঢের দামি জিনিস। একগাদা জড়োয়া গয়না। দুটো হার, দু'সেট কানের দুল, তিনগাছি বালা। পাঁচটা আংটি, একসেট বোতাম। সব সোনার। কোনও-কোনওটায় দামি পাথর বা মুক্তো বসানো। এ ছাড়া ছিল তিনটে আল্‌গা জুয়েল-স্টোন, দুটো চুনি এবং একটা পোখরাজ।"

"এসব আপনি ঘরে রাখেন!" অবাক হয়ে বলল পুলক।

বিশ্বনাথবাবু বললেন, "মোটেই রাখি না। ব্যাঙ্কের ভল্টে থাকে। মাত্র তিন দিন আগে আমি নিজে গিয়ে নিয়ে এসেছি ভল্ট থেকে। ইচ্ছে আছে এর ভিতর থেকে একটা গয়না দেব আমার এক ভাইঝি'র বিয়েতে। শিগ্‌গিরি তার বিয়ে। বাকি গয়না লিস্ট করে উইল করে যাব, আমার অবর্তমানে কে কী পাবে। আমার অন্য সব সম্পত্তির উইল করা হয়েছে। শুধু এই গয়নাগুলো বাকি। উইল হলে গয়না আবার ব্যাঙ্কে রেখে আসব। গতকাল সন্ধ্যায় একবার গয়নাগুলো বের করে বসি। কিন্তু শরীরটা জুত না ঠেকায় লিস্ট করতে ইচ্ছে হয়নি। তুলে রাখি আলমারিতে। আজ সকাল সাড়ে দশটায় ফের বের করি। তখনই বুঝতে পারি একটা আংটি খোয়া গেছে, এবং খেয়াল হয় চাবিটাও তো ঠিক জায়গায় ছিল না। ব্যানার্জিকে টেলিফোনে ধরতে দেরি হয়ে গেল। তুমি কখন খবর পেলে?"

"সাড়ে তিনটে নাগাদ," জানাল পুলক। এবং বলল, "আচ্ছা, শুধু একটা আংটি নেওয়ার কারণ কিছু ভেবেছেন কি?"

"হয়তো চোর ভেবেছে শুধু মাত্র একটা আংটি মিসিং হলে আমি ধরতে পারব না। তাই মনে হয় এটা বাড়ির কারও কীর্তি। বাইরের চোর হলে সব ক'টাই যেত। এবং এটা বুঝেছি, যে নিয়েছে সে বিশেষ জুয়েল চেনে না। কারণ ওখানে আর-একটা আংটি ছিল, যেটা নিয়েছে তার চেয়েও দামি।"

"নগদ টাকা ছিল কিছু লকারে?"

"না। ক্যাশ আমি বাড়িতে খুব কমই রাখি। দরকারমতো ব্যাঙ্ক থেকে আনাই। যা থাকে, তা আমার মানিব্যাগে। মানিব্যাগ ছিল আমার বিছানায় তোশকের তলায়। যখন চুরি টের পেলাম, বাড়ির পুরুষরা সবাই কাজে বেরিয়ে গেছে। তা নইলে সব্বাইকে আটকে রেখে বাড়ি সার্চ করতাম।"

"গয়নাগুলো ছিল কিসে?" পুলকের প্রশ্ন।

"একটা রেশমি থলিতে।"

"ব্যাঙ্ক থেকে আপনার গয়না আনার খবর বাড়িতে কে কে জানে?" পুলক জিজ্ঞেস করে।

বিশ্বনাথবাবু বললেন, "অনেকেই জানতে পারে। সেদিন আমার মেজো ছেলের সঙ্গে ওর গাড়িতেই ব্যাঙ্কে গিয়েছিলাম। একই সঙ্গে ফিরেছি। এখন একা-একা বাইরের কাজকর্ম করতে কষ্ট হয়। তাই বেশির ভাগ সময় কাউকে হেল্প করতে সঙ্গে নিই। এর পর খবরটা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়া স্বাভাবিক। গতকালই তো সকালে আমার বড় নাতনিটি বলে গেছেন, 'দাদু, গয়না এনেছ শুনলাম। দাও না পরে দেখি কেমন মানায়। দেখবে মুণ্ডু ঘুরে যাবে।'"

"আপনি পুলিশে খবর দিলেন না কেন?" পুলক জিজ্ঞেস করে।

"পুলিশ এলে হুলুস্থুলু লাগাত। পাড়ায় জানাজানি হত। বাড়ির লোককে অযথা হয়রান করত। আমি তা চাই না। এখনও এই চুরির কথা বাড়িতে কাউকে বলিনি। আমি ছাড়া আর-কেউ জানে না। অবশ্য আসল চোরটি বাদে।"

"আমার কাছে কী চান?" স্থির চোখে চেয়ে প্রশ্ন করল পুলক।

"যথাসম্ভব গোপন অনুসন্ধান। দোষী কে জানতে চাই। আট-দশ হাজার টাকার জিনিস খোয়া গেলে আমার যে খুব গায়ে লাগবে তা নয়। কিন্তু একজন লোভী, অসৎ, এই বাড়িরই কেউ চুরি করে পার পেয়ে যাবে, সেটা আমার অভিপ্রায় নয়। আংটি উদ্ধার হোক বা নাই হোক, কে দোষী সেটুকু জানতে পারলেও হবে। আদালতে নয়, আমি স্বয়ং তার শাস্তির ব্যবস্থা করব। তা ছাড়া লোভী চোর এ-যাত্রা রেহাই পেয়ে গেলে ভবিষ্যতে তার সাহস বাড়বে এবং আরও বড় অপকর্মে হাত দেবে। তাই কালপ্রিট কে, অন্তত সেটা তুমি বের করে দাও।"

পুলক ধীর স্বরে জানাল, "আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করব।"

"উত্তম," বিশ্বনাথবাবুর মুখে খুশির ঝলক, "চেষ্টা করে দ্যাখো। আংটিচোরকে ধরতে না পারলেও, তোমার চেষ্টার মূল্য, তোমার প্রাপ্য ফিজ আমি অবশ্যই দেব।"

"আজ্ঞে আমার চেষ্টা সফল না হলে আমি ফিজ নিই না," সবিনয়ে জানাল পুলক।"

"গুড, ভেরি গুড। ব্যানার্জি ঠিক লোককেই পাঠিয়েছে।"

"এবার আমার কিছু প্রশ্ন আছে," বলল পুলক।

"বেশ, করো। আমি সাধ্যমতো উত্তর দেব," বিশ্বনাথবাবু জানালেন।

"প্রথমে জানতে চাই, এই বাড়িতে কে কে থাকে? কে কোন্ ঘরে? একতলায় এবং দোতলায়।"

বিশ্বনাথবাবু গড়গড় করে উত্তর দিয়ে গেলেন, "দোতলায় পশ্চিমে আমার পরে শেষ ঘরটায় থাকে গোবিন্দ। তারপর আমার এই ঘর। এরপর বাথরুম। বাথরুমে আমার ঘর দিয়ে এবং বারান্দা দিয়ে ঢোকা যায়। তারপরের ঘরে থাকে নিশিকান্ত, আমার খুড়তুতো ভাই। এর পরের ঘরে আছে শিবু। শিবপদ। আমার নাতি হয় দূর সম্পর্কে।"

"সিঁড়ির ডাইনে উত্তরমুখো দুটো ঘর। প্রথমটায় থাকে আমার বড় ছেলে প্রমথ ও বড় বউমা। তার পরেরটায় আমার বড় ছেলের একমাত্র মেয়ে ঝুমা। পুবদিকের বারান্দার লাগোয়া দুটো ঘর। একটা গুদাম। অন্যটা বড় বউমার ঠাকুরঘর।

"নীচের তলার ঘরগুলো একই প্যাটার্নের। এই অংশের তলায় থাকে আমার ছোট ছেলে চন্দ্রনাথ ও ছোট বউমা এবং ওদের পাঁচ বছরের ছেলে বুবাই। তারপর বাথরুম, ড্রইংরুম। সিঁড়ির পাশের ঘরটা ফাঁকা থাকে। গেস্টরুম। আত্মীয়-স্বজন এলে থাকে। অন্যগুলো খাবার ঘর, রান্নাঘর, ভাঁড়ার। বাড়ির উত্তরে কম্পাউণ্ডের ভিতর আউট-হাউসে থাকে বামুনঠাকুর, সপরিবারে।"

পুলক খানিক চুপ করে ভাবল। বুঝি মনে-মনে ছকে নিল বাড়িটা। তারপর বলল, "এবার জানতে চাই, এই বাড়ির কে কী করেন, বয়স ইত্যাদি।"

এবারও চটপট উত্তর হল, "আমার বড় ছেলে প্রমথ চাকরি করে একটা আধা-বিদেশী ফার্মে। ভালই মাইনে পায়। তবে

ইদানীং ও শেয়ার মার্কেটে ঝুঁকেছে শুনছি। বড় বউমা সংসার সামলায়। শান্ত প্রকৃতির। মনটিও ভাল। বাপের বাড়ির অবস্থা সচ্ছল। নাতনি ঝুমা পড়ে কলেজে ফার্স্টইয়ারে।

"নিশিকান্ত অসুস্থ। আমারই বয়সী। ওর চোখ দুটোও গেছে। একেবারেই প্রায় দেখতে পায় না। ওর একমাত্র ছেলে আছে বিদেশে। স্ত্রী মারা গেছে। ব্যারাকপুরে থাকত একা। আমি এখানে এনে রেখেছি। ছেলেবেলায় একসাথে অনেক খেলাধুলো হৈ-হল্লা করেছি। সেই টান। বাড়ির লোকের অবিশ্যি ইচ্ছে ছিল না আর একটি রুগ্ন বৃদ্ধের ভার নেয়। আমি জোর করেই এনেছি। গোবিন্দই ওর সেবাযত্ন করে।

"শিবু মানে শিবপদর দেশের বাড়ি হুগলির এক গ্রামে। আমার এখানে আসে কলেজে পড়তে। বার-দুই ফেল করে পড়া ছেড়ে ব্যবসা ধরেছে। ইলেক্‌ট্রিকের কাজ বেশ জানে। তাই ইলেক্‌ট্রিক্যাল গুডসের দোকান দিয়েছে আরও দুই বন্ধুর সঙ্গে। দোকান শুনেছি মন্দ চলছে না। শুরুতে আমি তিন হাজার টাকা ধার দিয়েছিলাম পাঁচ বছরে শোধ করবে এই কড়ারে। চার বছরে মাত্র পাঁচশো টাকা শোধ দিয়েছে। তাগাদা লাগাচ্ছি। ছেলেটা বেশ খরচে। কিছু জমাতে পারে বলে মনে হয় না।

"আমার ছোট ছেলে এঞ্জিনিয়ার। বছর-দশেক চাকরি করে আপাতত স্বাধীন ব্যবসা শুরু করেছে। ঠিকেদারি। কনস্‌ট্রাক্‌শন-ফার্ম করেছে এক বন্ধুর সঙ্গে। বারণ করেছিলাম, শোনেনি। আসলে ওর পার্টনার বন্ধুটিকে আমার পছন্দ নয়। ভয় হয় লোকসান না দেয়। যাক গে, এটা ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার। ছোট বউমাটি কিঞ্চিৎ শৌখিন। বাইরে ঘোরেন বেশি। খরচেও আছে। আর কী জানতে চাও ?

"ঠাকুর-চাকর ?" পুলকের প্রশ্ন।

"চাকর একজন, গোবিন্দ। একজন ঝি আছে, লক্ষ্মীর মা। আর আছে রাঁধুনি বামুন।"

"এদের কাউকে আপনার সন্দেহ হয় ?"

"না। কারণ গোবিন্দ সন্দেহের ঊর্ধ্বে। আমার কাছে আছে তিরিশ বছর। অতি বিশ্বস্ত। বামুনঠাকুর এবং লক্ষ্মীর মা'ও পুরনো লোক। এবং বিশ্বাসী বলেই জানি। তা ছাড়া ওরা দু'জন আমার ঘরে ঢোকে না। এ-ঘরে কোথায় কী থাকে ওদের পক্ষে জানার কথা নয়। আমার ঘরের যাবতীয় কাজ করে গোবিন্দ। এ-কাজ ঝি-চাকরের বলে আমার মনে হয় না। তারা গরিব মানুষ। অতগুলো দামি-দামি জিনিস হাতে পেয়ে মাত্র একটি সরিয়ে লোভ দমন করা ? এতটা সংযম এবং বুদ্ধি ? উঁহু," বৃদ্ধ মাথা নাড়েন।

পুলক বলল, "অর্থাৎ আপনি বোঝাতে চান, এই কাজ আপনার ছেলে বা আত্মীয়দের কারও ?"

"হুঁ, তাই। আর সেইজন্যেই ব্যাপারটা চাউর হোক আমি চাই না।"

"কাউকে আপনার সন্দেহ হয় ?"

"প্রমাণ না পেয়ে কাউকে সন্দেহ করা কি উচিত ? তবে মানুষের স্বভাব অতি বিচিত্র। আর লোভ বড় শক্তিশালী রিপু।"

পুলক মাথা ঝাঁকিয়ে সমর্থন করল বিশ্বনাথবাবুর যুক্তি। তারপর বলল, "আলমারির চাবি যে আপনার বালিশের নীচে ছিল এ-খোঁজ কে কে জানতে পারে ?"

বিশ্বনাথবাবু বললেন, "এটা আমার পুরনো অভ্যেস। রাতে মাথার বালিশের তলায় আলমারির চাবি রাখি। গোবিন্দ বা বড়বউমা বিছানা তুলতে এসে অনেকবার দেখেছে। ওদের মুখ থেকে বাড়ির অন্যরাও জানতে পারে। আগে যখন ব্যবসা করতাম, খাওয়ার পর রাতে বসে হিসেবপত্র দেখতাম। ক্যাশ মেলাতাম। তারপর সব আলমারিতে তুলে রেখে চাবি রাখতাম বালিশের তলায়। তবে আমার স্ত্রী যদ্দিন জীবিত ছিলেন, মেঝেতে শতরঞ্চি পেতে বসে কাজ করতাম। তারপর বসতাম বিছানায়। টেবিল-চেয়ারে বসে বেশিক্ষণ কাজ করা আমার পোষায় না। দিনে অবশ্য চাবি থাকে এই ঘরে, একটা গোপন জায়গায়। তবে চুরি টের পাওয়ার পর চাবি এখানেই আছে। এই যে—" বিশ্বনাথবাবু বেডকভার তুলে বালিশের তলা হাতড়ে দুটি লম্বা চাবি বের করে দেখালেন।

তিনি তিক্ত হেসে বললেন, "সাধারণ অবস্থায় কেউ আমার বালিশ হাঁটকালে ঠিক টের পেতাম। আমার ঘুম খুব পাতলা। তবে ঘুমের ওষুধ খাওয়ার ফলে, হুঁ, বলতে পারো কেয়ারলেস হয়েছি। তবে কিনা আমার ঘর থেকে কখনও একটি জিনিসও চুরি যায়নি। বাড়ির কারও এতখানি দুঃসাহস হবে ভাবতে পারিনি।"

বিশ্বনাথবাবু ভুরু কুঁচকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মুখে ছাদের দিকে চেয়ে রইলেন।

ঘরের ঝকঝকে মসৃণ মেঝের দিকে তাকিয়ে পুলক বলল, "এই ঘর কখন মোছা হয় ?"

"প্রতিদিন সকাল এগারোটা নাগাদ," উত্তর দিলেন বিশ্বনাথবাবু।

"আজকে কি মোছা হয়েছে ?"

"না। আজ সকালে ঘটনাটা বুঝতে পেরেই আমি গোবিন্দকে এই ঘর ঝাঁট দিতে বা মুছতে নিষেধ করি। কারণটা বুঝেছ ? ফিংগারপ্রিণ্ট।"

"হুঁ, ঠিক করেছেন," বলল পুলক, "আচ্ছা গতকাল মোছার পর এ-ঘরে আপনি ছাড়া আর কে কে ঢুকেছে ?"

"গোবিন্দ, বড় বউমা। এবং তোমরা দু'জন। এ-ছাড়া আর একজন, যার পরিচয় আমি জানি না।"

"অর্থাৎ যে চুরি করেছে ?"

"হুম।"

"বড় বউমাকে আপনার সন্দেহের লিস্ট থেকে তা হলে বাদ দিচ্ছেন ?" বলল পুলক।

"না, না, জোর দিয়ে তা অবশ্যই বলতে পারি না। তবে কিনা…" বিশ্বনাথবাবুর মুখ দেখে তাঁর মনের ভাব বোঝা গেল।

"আপনার বড় বউমা কী করতে ঘরে ঢুকেছিলেন ?" জিজ্ঞেস করে পুলক।

"খাবার দিতে। বাতের ব্যথা বাড়লে আমি নীচে খাবার ঘরে খেতে যাই না। এই ঘরেই খাই। ওই টেবিলটায়। বউমা দুপুর আর রাতের খাবার নিয়ে আসে। গোবিন্দ আনে চা জলখাবার। এ ছাড়া বউমা দু'বার ওষুধ খাওয়াতে এসেছে।"

পুলক চেয়ার ছেড়ে উঠল। ঘরে মেঝের ওপর চোখ রেখে গোটা ঘরে ধীরে ধীরে চক্কর খেতে লাগল। পকেট থেকে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করল। কখনও-কখনও উবু হয়ে বসে

ওই কাঁচের ভিতর দিয়ে গভীর মনোযোগে পরীক্ষা করল মেঝের জায়গায়-জায়গায়। ফের সে চেয়ারে এসে বসে প্রশ্ন করল, "জুতো মানে শ্যু পায়ে কেউ ঢুকেছিল এই ঘরে?"

"শ্যু!" বিশ্বনাথবাবুর ভুরু কুঁচকোন, "না। এ ঘরে রাস্তায় ঘোরা চটি, জুতো পরে ঢোকা আমি পছন্দ করি না। বউমা বা গোবিন্দ ঢোকে খালি পায়ে। আমি নিজেও বাইরের জুতো বারান্দায় খুলে ঘরে ঢুকি। গোবিন্দ সেটা ঝাড়পোঁছ করে ঘরে রাখে।"

"কিন্তু শ্যু পায়ে ঢুকেছিল কেউ," দৃঢ় স্বরে জানাল পুলক, "আমি ছাপ দেখছি।"

"তা হলে সেই নির্ঘাত চোর।" রাগে গরগর করে ওঠেন বৃদ্ধ। শুধু চুরির অপরাধে নয়, তাঁর ঘরে জুতো পায়ে ঢোকাও মনে হল তাঁর রাগের কারণ।

"চণ্ডীবাবুকে একবার ডেকে আনা দরকার। আপনার টেলিফোনটা ব্যবহার করতে পারি?" জুতোর প্রসঙ্গ থেকে সরে এসে বিছানার পাশে টুলে রাখা টেলিফোন-যন্ত্রটি দেখাল পুলক।

বিশ্বনাথবাবু বললেন, "বিলক্ষণ। চণ্ডীবাবু কে?"

"ফিংগারপ্রিন্ট এক্সপার্ট। আগে পুলিশে ছিলেন। রিটায়ার্ড। এখন প্রাইভেট কাজ করেন। ওঁর ওপরের ফ্ল্যাটে ফোন আছে। চণ্ডীবাবুকে চাইলে ডেকে দেয়।"

চণ্ডীবাবু এলেন আধ ঘণ্টার মধ্যে। মাঝারি লম্বা, পোক্ত গড়ন। ছোট করে ছাঁটা কাঁচা-পাকা চুল। রং রোদে পোড়া তামাটে। গম্ভীর, ভারিক্কি ধরন। গোবিন্দ তাঁকে পৌঁছে দিল বিশ্বনাথবাবুর ঘরের দোর অবধি। চণ্ডীবাবুও জুতো খুলে মোজা পায়ে ঘরে ঢুকলেন। পুলক তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল বিশ্বনাথবাবুর। একটি সংক্ষিপ্ত নমস্কার জানিয়ে চণ্ডীবাবু চেয়ার নিলেন।

পুলক কাজের কথায় এল, "এই ঘরের মেঝেতে বিশেষ করে ওই আলমারি সামনে পায়ের ছাপ যা পাবেন প্রিন্ট চাই। মনে হচ্ছে জুতোর ছাপও রয়েছে। আর বিশ্বনাথবাবু এবং গোবিন্দর হাত ও পায়ের প্রিন্টটাও নেবেন।"

চণ্ডীবাবু অভ্যস্ত দক্ষতায় কাজ শুরু করলেন।

জয় আগে চণ্ডীবাবুর কাজের পদ্ধতি দেখেছে। তবে বিশ্বনাথবাবু মহা কৌতূহলে গলা বাড়িয়ে লক্ষ করতে থাকেন।

সন্দে নক ছাপের ওপর বিশেষ ধরনের পাউডার ছড়িয়ে হালকা ব্র । করতে ছাপ স্পষ্ট হয়। এরপর চণ্ডীবাবু ক্যামেরা বের করে ফ্ল্যাশ-বালবের সাহায্যে অনেকগুলি ছাপের ফোটো তুললেন।

জয় ফিসফিস করে পুলককে বলল, "আলমারির হাতল আর চাবিগুলো দেখবে না? চোরের আঙুলের ছাপ পেতে পারো।"

উত্তর হল, "লাভ নেই। বিশ্বনাথবাবুর আঙুলের ছাপে অপরাধীর ফিংগারপ্রিন্ট মুছে গেছে।"

পুলক ফের মেঝেতে ঝুঁকে পড়ে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যে কয়েক জায়গা লক্ষ করল। একটা রুলারের সাহায্যে কিছু মাপ নিয়ে টুকে রাখল নোটবইয়ে। টেবিলের ওপর রাখা প্লাস্টিকের ঢাকাসুদ্ধু কাঁসার গেলাসটা দেখিয়ে বলল, "এটা শেষ কে ধরেছে?"

"বড় বউমা", জানালেন বিশ্বনাথবাবু।

"তা হলে এটাও চাই," বলল পুলক, "দু-একদিনের জন্য।"

চণ্ডীবাবু গেলাসটা কাগজে মুড়ে ব্যাগে ভরলেন।

পুলক চাবি দিয়ে বারকয়েক আলমারি খুলল, বন্ধ করল। গয়নার রেশমি থলিটি ছাড়াও দুটি সুন্দর নক্‌শা-কাটা ছোট-ছোট কাঠের বাক্স ছিল লকারে। বিশ্বনাথবাবু জানালেন যে, বাক্স দুটো খালি। পুলক বাক্স দুটো চেয়ে নিয়ে চণ্ডীবাবুর হেফাজতে দিল। যদি ফিংগারপ্রিন্ট কিছু মেলে! বলা যায় না অপরাধী হয়তো ওই বাক্সগুলোও খুলেছে।

চণ্ডীবাবু বিদায় নিলেন।

পুলক বলল, "এবার আমরাও যাব। আবার কবে আসব বলতে পারছি না। বোধহয় দু-চারদিনের মধ্যেই। আপনার বাড়ির লোকজনদের সম্বন্ধে কিছু খোঁজখবর নিতে হবে গোপনে। ইতিমধ্যে আপনি কাউকে কিছু বলবেন না এ-বিষয়ে। হয়তো আপনার বাড়ির লোককে জেরা করার দরকার হতে পারে ভবিষ্যতে।"

"বেশ," বিশ্বনাথবাবু সম্মতি জানালেন।

"তাঁরা রাজি হবেন তো আমার প্রশ্নের জবাব দিতে?"

"আলবত রাজি হবে। আমার হুকুম। তা নইলে আমি সত্যি পুলিশে খবর দেব। তাতে তাদের সম্মান কমবে বই বাড়বে না।"

পুলক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমার কাজের বিষয়ে আগেই বলেছি। তবে চণ্ডীবাবুর বিলটা পরের বার আনব, মিটিয়ে দেবেন। হ্যাঁ, বাড়ির কাউকে আমাদের পরিচয় এখন দেবেন না। কেউ কৌতূহল দেখালে বলবেন—আচ্ছা, আপনার কোনও মামলা চলছে কি?"

বিশ্বনাথবাবু বললেন, "একটা কেন, দু-দুটো মকদ্দমা ঝুলে আছে। ব্যানার্জিই আমার ল-ইয়ার। সম্পত্তি থাকলেই এসব ঝক্কি থাকে।"

"বেশ বেশ, তা হলে বলে দেবেন, আমরা ব্যারিস্টার

ব্যানার্জির লোক। মামলার কাজে এসেছি। অবশ্য পরে আমাদের আসল পরিচয় জানাজানি হবে ঠিকই," বলল পুলক।

নিশিকান্তবাবুর ঘরের পাশ দিয়ে চলেছে পুলকরা, সেই খনখনে গলা ভেসে এল আধখোলা দরজার ওধার থেকে, "কে কে?"

"আজ্ঞে সেই বাবুরা ফিরছেন," জবাব দিল গোবিন্দ। যেতে যেতে গোবিন্দ দুঃখিত স্বরে বলল, "নিশিকান্তবাবুর ভারী কষ্ট। হাঁপানির টানটা বেড়েছে। ক'দিন মোটে ঘুম হচ্ছে না। ঠায় জেগে বসে থাকেন।"

রাস্তায় যেতে যেতে জয় বলল, "পুলকদা, বিশ্বনাথবাবুর বাড়ির লোকদের সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে তোমার গুপ্তচর বাহিনীকে লাগাবে, তাই না?"

"কারেক্ট।" পুলক মাথা ঝাঁকাল।

পুলকের কিছু গুপ্তচর আছে। তাদের কয়েকজনকে দেখেছে জয়। এরা নানান ধরনের, নানা বয়সী লোক। কাউকে দেখতে নেহাত গোবেচারা, যেন অফিসের বাবু। কেউ দারুণ স্মার্ট, চালাক-চতুর। কেউ মাস্তান টাইপের। পয়সার বিনিময়ে এরা পুলকের নির্দেশে নানান খোঁজখবর জোগাড় করে দেয় গোপনে। কয়েকজন মেয়েও নাকি আছে এই দলে। কীভাবে এদের জোটাল পুলক, জয় তা জানে না। এরা সবাই নাকি পুলকের বেজায় ভক্ত এবং বিশ্বাসী।

॥ দুই ॥

বিশ্বনাথবাবুর বাড়ি পুলকরা প্রথমবার গিয়েছিল মঙ্গলবার। শুক্রবার সকালে জয় পুলকের বাড়ি যেতেই পুলক বলল, "আজ দুপুরে একবার মজুমদার-বাড়ি যাব, তিনটে নাগাদ। বিশ্বনাথবাবুর দিবানিদ্রার ব্যাঘাত হবে, কিন্তু উপায় নেই। কারণ ওই সময়টা মজুমদার-বাড়ি বেশ ফাঁকা থাকে। তুমি যাবে নাকি সঙ্গে?"

"আলবত যাব," জানাল জয়।

"তা হলে চলে এসো আড়াইটের মধ্যে।"

জয় বলল, "মজুমদার-বাড়ির লোকদের সম্বন্ধে খোঁজখবর কীরকম পেলে?"

পুলক বলল, "হুঁ, আমার সিক্রেট সার্ভিসের রিপোর্ট কিছু মিলেছে। শুনবে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ।" জয়ের বেজায় কৌতূহল।

পুলক বলে, "সন্দেহটা আপাতত কয়েকজনের ওপর সীমাবদ্ধ রেখেছি বিশেষ কারণে। এদের মঙ্গলবারের গতিবিধিটা খুব ইম্পর্টান্ট। কারণ সোমবার রাতে আংটি চুরি করলে পরদিনই হয়তো চোর সেটা পাচার করার চেষ্টা করবে। এক এক করে বলছি। চা খাবে তো? হরিহর, চা..."

বেতের চেয়ারে আরাম করে পা ছড়িয়ে বসে খানিক আপনমনেই বলে চলে পুলক, "বিশ্বনাথবাবুর বড় ছেলে প্রমথনাথ সেদিন যথারীতি সকাল সাড়ে-নটায় অফিসের পথে রওনা হয়েছিলেন। উনি মিনিবাসে অফিস যান। পাড়ার আরও কয়েকজন ডালহৌসিতে অফিস করতে যায় ওই একই বাসে। তারা সাক্ষী।

"অফিসে টিফিনের সময় উনি বেরিয়েছিলেন। নাকি এক বন্ধুর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল কাছের এক রেস্তোরাঁয়। ফেরেন সওয়া দুটোয়। বন্ধুর রেস্তোরাঁয় গিয়েছিলেন ঠিকই। তবে সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন পৌনে দুটোয়। ওই রেস্তোরাঁ থেকে ওঁর অফিস পৌঁছতে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগা উচিত নয়। সুতরাং বাকি পঁচিশ মিনিট কী করেছেন?

"অবশ্য অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে দেরি করেননি। ঠিক সময়েই বাস ধরে ফেরেন। সন্ধে সাতটায় আবার বেরোন। ফেরেন ন'টা নাগাদ। কাছেই এক বন্ধুর বাড়িতে তাস খেলতে গিয়েছিলেন। তাস খেলা হয়েছিল ঠিকই। তবে সেখানে যাওয়া-আসার পথে অন্য কোথাও গিয়েছিলেন কি না বা বন্ধুর বাড়ি তাস খেলা ছাড়া আর কিছু করেছেন কি না এখনও চেক-আপ করা যায়নি।

"এবার দ্বিতীয় পুত্র চন্দ্রনাথ। ইনি এখন প্রতিদিন বেহালায় কাজে যান সকাল ন'টা নাগাদ, ব্রেকফাস্ট সেরে। ওখানে একটা মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং হচ্ছে, উনি সেটা তৈরির কন্ট্রাক্ট নিয়েছেন। মঙ্গলবারও ঠিক সময়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ন'টায় হাজির হন স্পটে। এগারোটায় সেখান থেকে যান ব্যাঙ্কে। ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এক পার্টির সঙ্গে লাঞ্চ সারেন পার্ক স্ট্রিটের এক হোটেলে। ফের যান বেহালায় বেলা দুটোয়। সেখানে থাকেন চারটে অবধি। বাড়ি ফেরেন সাড়ে চারটেয়। সন্ধে ছ'টায় বেরিয়েছিলেন স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে। রাত সাড়ে আটটায় বাড়ি ফেরেন। রবীন্দ্রসদনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন দু'জনে। চন্দ্রনাথের নিজের মোটর আছে। তাতেই যাতায়াত করেন। ব্যাঙ্কে বা হোটেলে যাওয়া-আসার পথে অন্য কোথাও টুঁ মেরেছিলেন কি না জানা যায়নি। হ্যাঁ, মেজোগিন্নি সন্ধেয় বেরুবার আগে পর্যন্ত বাড়িতেই ছিলেন।

"এবার শিবু। শিবুর অভ্যেস চা-টা খেয়ে সকাল আটটায় ওর দোকানে যাওয়া। দুপুরে প্রায় একটায় বাড়িতে খেতে আসে। খানিক বিশ্রাম করে। তিনটে নাগাদ ফের দোকানে যায়। রাত আটটায় দোকান বন্ধ হলে কোনও-কোনওদিন তক্ষুনি একবার বাড়ি ঘুরে গিয়ে আবার বার হয়। কখনও-কখনও ফেরে একদম রাত ন'টা সাড়ে ন'টায়, আড্ডা মেরে বা সিনেমা-টিনেমা দেখে। মঙ্গলবার ও রাত সাড়ে-আটটায় বাড়ি এসে চা খেয়ে ঘণ্টাখানেক বাইরে ঘুরে আসে। হাজরা-মোড়ের বান্ধব কাফেতে আড্ডা মেরেছে। অবশ্য পুরো সময়টা ওইখানেই কাটিয়েছিল কি না এখনও ঠিক জানি না।"

পুলক থামল। জয়ের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী বুঝলে?"

"বুঝলাম, মজুমদার-বাড়ি থেকে এই যারা বাইরে বেরিয়েছিল, তারা প্রত্যেকেই আংটি পাচার করার সুযোগ পেয়েছে," উত্তর দিল জয়।

পুলক চিন্তিতভাবে বলল, "হুঁ, সেটাই মুশকিল। দেখা যাক। তবে আমার এজেন্টরা এই ক'জনকে সমানে ফলো করে যাচ্ছে। খুঁটিনাটি খোঁজ নিচ্ছে। যদি কোনও ক্লু পাওয়া যায়!"

দুপুর তিনটে বাজে। ঝাঁ-ঝাঁ রোদ। রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের দিক থেকে সদানন্দ রোড ধরে পায়ে হেঁটে এগুচ্ছে পুলক ও জয়। সহসা ঝলমলে শার্ট ও চোঙা ফুলপ্যান্ট পরা কাপ্তেন টাইপের এক ছোকরা এসে দাঁড়াল সামনে। পুলক থমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল ছেলেটিকে, "কী, লাইন ক্লিয়ার?"

"ইয়েস স্যার," ছেলেটি উত্তর দিল।

"কোথায় গেছে ?"

"দোকানে।"

"অল রাইট। তোমার এখন ডিউটি অফ;" পুলক ছেলেটিকে জানাল, "চলো জয়।" পুলক ফের এগোল মজুমদার-বাড়ির উদ্দেশে।

"কে দোকানে গেছে," উৎসুক জয় প্রশ্ন করে।

"শিবপদ। দিবানিদ্রা সেরে আপাতত তার দোকানে ফিরেছে।"

গোবিন্দ বোধহয় অপেক্ষায় ছিল। কারণ কলিং-বেল টেপা মাত্র সে দরজা খুলে দিল। গোবিন্দ যখন পুলকদের বিশ্বনাথবাবুর ঘরে পৌঁছে দিল, মজুমদার-বাড়ি তখন নিঝুম। কেবল চোখের আড়ালে কলতলায় বাসন মাজার ঠুনঠান আওয়াজ কানে আসছে। গোবিন্দ বিশ্বনাথবাবু এবং নিশিকান্তবাবু ছাড়া আর কেউই বোধহয় টের পেল না পুলকদের আগমন।

নিশিকান্তবাবুর কান ফাঁকি দেওয়া যায়নি। ওঁর ঘর পেরোবার সময় আধখোলা দরজার ভিতর থেকে প্রশ্ন এল, "কে ?"

পর মুহূর্তে নিজেই জবাব দিলেন, "ও গোবিন্দ। আর সেই দুজন বুঝি ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ," জানাল গোবিন্দ।

বিশ্বনাথবাবুকে দেখে মালুম হল, তিনি সবে দিবানিদ্রা সেরে উঠেছেন, বালিশের ওপর তাকিয়া চাপিয়ে ঠেস দিয়ে বসেছিলেন।

"কী হে অনুসন্ধানী, কদ্দুর এগোল কেস ?" পুলক ঘরে ঢোকামাত্র জানতে চাইলেন বিশ্বনাথ মজুমদার।

"আজ্ঞে এখনও এগোয়নি বিশেষ। হাতড়াচ্ছি," পুলক জবাব দিয়ে কিন্তু বসল না। জয়কে বলল, "তুমি এ-ঘরে অপেক্ষা করো। আমি গোবিন্দর সঙ্গে কটা কথা বলতে চাই প্রাইভেটলি। চলো গোবিন্দ তোমার ঘরে।" পুলক কাউকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়েই গোবিন্দকে একরকম ঠেলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

বিশ্বনাথবাবু তির্যক চোখে দেখলেন ব্যাপারটা। কিন্তু কোনও মন্তব্য করলেন না। পুলক ও গোবিন্দ চলে যেতেই বিছানায় আধশোয়া হয়ে চোখ বুজলেন। অগত্যা জয় টেবিলে রাখা দৈনিক পত্রিকাটা টেনে নিয়ে চোখ বোলাতে লাগল। মিনিট দশ-বারো বাদে তার কানে এল পায়ের শব্দ। পুলক বিশ্বনাথবাবুর ঘরে ঢুকল না, সামনে দিয়ে চলে গেল। খানিক এগিয়ে থামল পদশব্দ। অল্প কথাবার্তার আওয়াজ। নিশিকান্তবাবুর চেরা কণ্ঠস্বর। এরপর আর কিছু শোনা যায় না।

"গোবিন্দ," ডাকলেন বিশ্বনাথবাবু।

"আজ্ঞে ?" সাড়া দিয়ে ঘরে ঢোকে গোবিন্দ।

"পুলকবাবু কোথায় ?"

"আজ্ঞে নিশিদাদুর সঙ্গে কথা বলছেন, ওঁর ঘরে দরজা বন্ধ করে।"

"ঠিক আছে, তুই যা।"

গোবিন্দ বিদায় নিল।

পুলক নিশিবাবুর ঘর থেকে বেরোল মিনিট কুড়ি বাদে। ফের সে গোবিন্দকে বারান্দার কোণে ডেকে নিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলল। তারপর ঢুকল বিশ্বনাথবাবুর ঘরে।

জয় ও বিশ্বনাথবাবু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে পুলকের দিকে। পুলকের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। সে নির্বিকার। তবে জয়ের ঠাওর হল পুলকের মুখে একটা চাপা খুশির আভাস। পুলক দিব্যি খোশমেজাজে গোবিন্দকে ডাক দিয়ে বলল, "এক কাপ চা খাওয়াতে পারো ? তবে অন্য কাউকে বিরক্ত করা চলবে না। তোমায় নিজে বানাতে হবে। স্রেফ চা। মাথাটা বেশ ধরেছে। জয়, তুমি খাবে ? বেশ, দু কাপ চা। কী বিশ্বনাথবাবু, অসুবিধা হবে ?"

বিশ্বনাথবাবু উঠে বসে খরদৃষ্টিতে দেখছিলেন। তিনি ইশারায় গোবিন্দকে চা আনতে পাঠিয়ে দিলেন।

যেই গোবিন্দ গেল, অমনি পুলক বলল, "জয়, তুমি কাগজ পড়ো, আমি বারান্দায় একটু পায়চারি করি। বারান্দা থেকে বাড়িটা একবার সার্ভে করতে চাই," বলেই সে বেরিয়ে গেল।

জয় মুখ কালো করে খবরের কাগজ রেখে এবার টেবিলে রাখা পাঁজিটা নিয়ে ওলটাতে লাগল। পুলক কথার সুরে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, সে একা থাকতে চায়। তাই জয় বাধ্য হয়ে পুলকের সঙ্গ ধরতে পারল না। বিশ্বনাথবাবু চোখ পিটপিট করে স্বগতোক্তি করলেন, "গোবিন্দকে সরিয়ে দিল এবং ওয়াটসনকেও সঙ্গে নিল না, হুম্।" তিনি ফের তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে ঝিমুতে লাগলেন।

গোবিন্দ চা আনল মিনিট-পনেরোর মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ফিরল পুলক। চায়ে চুমুক দিল, 'আঃ'। তারপর বলল, "গোবিন্দ, একবার কষ্ট করবে ? তুমি নীচে গিয়ে মালির ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দ্যাখো। আমি এই সামনের বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাব। লক্ষ করবে, আমায় তুমি দেখতে পাও কি না ?"

"আজ্ঞে তা দেখা যাবে," জানাল গোবিন্দ, "আমি নিজে কতবার দেখেছি।"

"আচ্ছা মালির ঘরের জানলা দিয়ে দেখা যায় এই বারান্দা ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, যায়।"

"বেশ, বেশ," পুলক খুশি হয়ে ওঠে। সে ঘড়ি দেখে বলল, "এখন চারটে দশ। প্রমথবাবু অফিস থেকে ফিরবেন কখন ?"

"আজ্ঞে তা ছটা বাজবে," গোবিন্দ জানায়।

"আর চন্দ্রনাথবাবু ?"

"তার ফেরার ঠিক নেই।"

"শিবপদবাবু ?"

"ওনারও কিছু ঠিক নেই। কোনও দিন আটটা সাড়ে-আটটায় ফেরেন। কখনও আরও দেরি হয়।"

"ও আচ্ছা," বলল পুলক, "বিশ্বনাথবাবু, আমরা এখন চলি। আবার আসব সাড়ে-পাঁচটা নাগাদ। আপনার বাড়ির কয়েকজনকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। গোবিন্দ, পারলে তুমি ওই সময় সদর দরজায় থেকো। যতটা সম্ভব চুপচাপ এই ঘরে ঢুকে পড়ব, কেমন ?"

পুলক ও জয় বিদায় নিল।

বিকেল পাঁচটা পঁয়ত্রিশে মজুমদার-বাড়ির দোতলায় উঠে জয় দেখল, একটি সুশ্রী তরুণী প্রমথবাবুর ঘরের সামনে বারান্দায় রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তাদের দেখছে। নিশ্চয় ও প্রমথনাথের কন্যা ঝুমা। হাতে পোর্টফোলিও ব্যাগ, গম্ভীর

চালে পুলক ধীর পদক্ষেপে প্রবেশ করল বিশ্বনাথবাবুর ঘরে। পিছু-পিছু ব্যাগ হাতে জয়। ভাবখানা, যেন কোনও জরুরি মকদ্দমার কাজে তাদের আগমন। গোবিন্দকে বলা হল যে, প্রমথবাবু এলেই যেন তাঁকে সোজা নিয়ে আসা হয় এই ঘরে।

বিশ্বনাথবাবু বিছানায় বসে ছিলেন যথারীতি তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে। পুলক তাঁর মাথার কাছে খাটের ধারে চেয়ার টেনে বসল। সে জয়কে বলল, "তুমি আমার পেছনে চেয়ারে বোসো।"

পুলকের সামনে রইল একটা ফাঁকা চেয়ার।

পুলক এবার খোশগল্প জুড়ে দিল। কয়েকটি পরামর্শও হয়ে গেল তদন্তের ব্যাপারে। একবার লঘু পায়ের আওয়াজ শোনা গেল বারান্দায়। বোঝা গেল কৌতূহলী ঝুমা পাক খেয়ে গেল সামনে দিয়ে।

আধঘণ্টাটাক বাদে। ভারী পায়ের শব্দ বারান্দা দিয়ে এসে থামে পর্দার বাইরে। ভেসে আসে ভারিক্কি কণ্ঠস্বর, "বাবা আমায় ডেকেছ?"

"ও প্রমথ, ভিতরে এসো," বিশ্বনাথবাবু আহ্বান জানান।

প্রমথনাথ পর্দা সরিয়ে ঢুকেই ঘরে দুজন অপরিচিত যুবককে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। বাপের সঙ্গে তাঁর চেহারার মিল খুব কম। রঙ ময়লা। শরীরও কিঞ্চিৎ স্থূল। অর্ধেক মাথাজোড়া টাক। পুরুষ্টু গোঁফ। নাক চাপা না হলেও, বাবার তীক্ষ্ণতা নেই। পরনে ফুল শার্ট ও ট্রাউজার্স। চোখে চওড়া কালো ফ্রেমের চশমা। পায়ে জুতোবিহীন মোজা।

"বোসো," পুলকের সামনের চেয়ারটা দেখালেন বিশ্বনাথবাবু।

প্রমথনাথ আড়ষ্টভাবে বসলেন।

বিশ্বনাথবাবু পুলকের দিকে চেয়ে বললেন, "এই আমার বড়ছেলে প্রমথ। আর এঁরা? হ্যাঁ, বুঝলে প্রমথ, একটা দরকারে ডেকেছি তোমায়। এঁরা দু'জন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। আমি ওঁদের অ্যাপয়েন্ট করেছি। আমার একটা জিনিস হারিয়েছে বা বলতে পারো চুরি গেছে, সেই ব্যাপারে ইনভেস্টিগেশনের জন্য। তোমায় এই পুলক রায় কিছু প্রশ্ন করবেন। উত্তর দিও।"

পুলক ও জয় হাত তুলে নমস্কার জানাল। ভদ্রতার খাতিরে প্রমথনাথ হাতজোড় করলেন বটে, তবে তাঁর মুখ থমথমে হয়ে উঠল। ভাব দেখে মনে হল এক্ষুনি বুঝি ফেটে পড়বেন রাগে। নেহাত অতি প্রতাপশালী ও প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বাপের ভয়েই নিজেকে সামলে নিয়ে তিক্তস্বরে বললেন, "কী হারিয়েছে?"

পুলক চট করে বলে উঠল, "মিঃ মজুমদার, প্লিজ, সেটা এখন জানতে চাইবেন না, পরে জানাব। আমি এখন দু-চারটে প্রশ্ন করব। বেশি নয়। আপনি অফিস থেকে সবে ফিরেছেন, টায়ার্ড।"

প্রমথনাথ কোনও কথা না বলে ঠোঁট টিপে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে পুলককে একবার দেখে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে রইলেন।

পুলক অত্যন্ত ভদ্রভাবে বলল, "আচ্ছা মিঃ মজুমদার, গত সোমবার অফিস থেকে ফিরে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন, এবং কখন ফিরলেন, যদি কাইণ্ডলি বলেন।"

"গত সোমবার? সে কি মনে আছে ছাই!" গজগজ করেন প্রমথনাথ।

"একটু মনে করুন প্লিজ," পুলকের অনুরোধ।

খানিক গোঁজ হয়ে ভেবে নিয়ে প্রমথনাথ বললেন, "হুঁ নেমন্তন্ন ছিল। বন্ধুর বাড়িতে, লেকের কাছে। ফিরেছি বোধহয় রাত সাড়ে-নটা দশটায়।"

"বাড়ি ফিরে কী করলেন?"

"সোজা নিজের ঘরে ঢুকলাম।"

"বাথরুমে যাননি?"

"ও হ্যাঁ," চমকে যান প্রমথনাথ। "হ্যাঁ হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। পথে বৃষ্টির জল জমেছিল। পাশ দিয়ে মোটর যেতে জলকাদা ছিটকে লাগে গায়ে। তাই বাড়ি এসেই বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে ঘরে যাই। আর-একবার বাথরুমে যাই মিনিট পনেরো কুড়ি বাদে, শোবার ঠিক আগে।"

"আচ্ছা সেদিন কি আপনি রাবার সোলের জুতোটা পরে বেরিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ!" বিস্মিত ও সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে উত্তর দেন প্রমথনাথ।

"প্রথমবার কি বাইরের জুতো, পোশাক পরেই সোজা বাথরুমে ঢুকেছিলেন?"

"হুঁ।"

"আর দ্বিতীয়বার?"

"চটি পায়ে। ঘরের পাজামা আর গেঞ্জি পরে।"

"জুতোটা কোথায় ছেড়ে রেখেছিলেন, ঘরে?"

"না, বাইরে। আমার দরজার পাশে।"

"কেন?"

"নোংরা জুতোয় কাদা লেগেছিল, তাই ঘরে ঢোকাইনি। এটা আমার অভ্যেস।" প্রমথনাথ একবার বিশ্বনাথবাবুর দিকে চাইলেন। জয়ের মনে হল, এই অভ্যেস তিনি তাঁর বাবার কাছ থেকেই হয়তো পেয়েছেন।

পুলক নিজের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে প্রমথনাথের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা মিঃ মজুমদার, বাথরুমে যাবার সময় আপনি কি আপনার বাবার ঘরে উঁকি দিয়েছিলেন?"

"না।"

"ঠিক মনে আছে?"

"মানে! কী বলতে চাইছেন? আমি মিথ্যে বলছি?" প্রমথনাথ তেতে ওঠেন। "আমি বাথরুমের দরজা পেরিয়ে এক পা-ও এগুইনি।"

"ব্যস, ব্যস। ঠিক আছে, ঠিক আছে।" পুলক যেন লজ্জিত। "রাগ করবেন না, স্রেফ রুটিন কোয়েশ্চেন। আর আপনাকে আটকাব না। প্রয়োজন হলে পরে কথা হবে। একটি অনুরোধ। আমাদের সঙ্গে আপনার কী কথাবার্তা হল, এখন তা জানাবেন না কাউকে। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবেন যে, বিশ্বনাথবাবুর মকদ্দমার ব্যাপারে কথা হচ্ছিল। আমরা ব্যারিস্টার ব্যানার্জির অ্যাসিস্ট্যান্ট।"

প্রমথনাথ ইতস্তত করে বললেন, "কিন্তু কী চুরি গেছে।"

"পরে শুনতে পাবেন," অমায়িক হেসে জানাল পুলক।

"ননসেন্স!" প্রমথনাথ উঠে হনহন করে বেরিয়ে গেলেন।

পুলক ঘড়ি দেখে বলল, "ছটা চল্লিশ। বিশ্বনাথবাবু, একবার গোবিন্দকে ডাকবেন?"

"গোবিন্দ," হাঁক দিলেন বিশ্বনাথবাবু।

গোবিন্দ ধারেকাছেই ছিল। দ্রুত হাজির হল।

পুলক জিজ্ঞেস করল, "গোবিন্দ, চন্দ্রনাথবাবু ফিরেছেন ?"

"আজ্ঞে না।"

"আচ্ছা, শিবপদবাবুকে ডেকে আনতে পারবে ? ওর দোকানেই পাবে বোধহয়। বলবে বিশ্বনাথবাবু ডাকছেন। একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে এই ঘর অবধি।"

গোবিন্দ বড়বাবুর দিকে তাকাল। বিশ্বনাথবাবু ইঙ্গিত করলেন— যাও যা বলছেন করো।

গোবিন্দ চলে গেল।

বারান্দায় পায়ের আওয়াজ হয়।

"দাদু," দরজার বাইরে মৃদু গলা শোনা গেল।

"শিবু, এসো।" বিশ্বনাথবাবু ডাকলেন।

একটি বছর পঁচিশের যুবক পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে পুলকদের দেখে থমকে গেল। রোগা। চোয়াড়ে চেহারা। রঙ কালো। মাঝারি লম্বা। হালের এক বিখ্যাত ফিল্ম-স্টারের ছাঁদে মাথার টেরি। পরনে হলুদ রঙা পাঞ্জাবি ও ট্রাউজার্স। পা খালি।

শিবু বিশ্বনাথবাবুকে বলল, "আমায় ডেকেছেন ?"

"হুঁ, বোসো," ফাঁকা চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন বিশ্বনাথবাবু, "শোনো, এই এনারা হচ্ছেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। আমার একটা জিনিস চুরি গেছে। আমি এঁদের ভার দিয়েছি ইনভেস্টিগেশনের। এঁরা তোমায় কিছু প্রশ্ন করবেন। উত্তর দিও।" তিনি পুলককে বললেন, "এই হচ্ছে শিবপদ মজুমদার। সম্পর্কে আমার নাতি।"

পুলক এবার কিন্তু নমস্কার জানাল না। গ্যাঁট হয়ে বসে শুধু একবার মাথা ঝাঁকাল।

"অ্যাঁ, চুরি ! কী চুরি ?" শিবপদ অবাক।

"সেটা পরে জানতে পারবেন," পুলকের জবাব।

"ও !" সন্ত্রস্ত ভাবে বসল শিবু।

পুলক গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা শিবপদবাবু, গত সোমবার রাতে আপনি বাড়ি ফিরেছিলেন ক'টায় ?"

"সোমবার ?" মুখ নিচু করে একটু ভেবে নিয়ে শিবু বলল, "এই রাত ন'টা নাগাদ হবে। দোকান থেকে বেরিয়ে খানিক গল্পগুজব করে তারপর বাড়ি ফিরি।"

"খেলেন ক'টায় ?"

"বাড়ি ফিরেই।"

"খাবার পরে কী করলেন ?"

"খানিকক্ষণ বই পড়ি ঘরে বসে, তারপর শুই।"

"কী বই ?"

"একটা রহস্য পত্রিকা।"

"কখন শুলেন ?"

"ঠিক মনে নেই। এই রাত সাড়ে-দশটা-এগারোটা হবে।"

"ঘর থেকে আর বেরোননি ?"

"না। ও হ্যাঁ, বাথরুমে গিয়েছিলাম একবার শোবার আগে।"

"বাথরুমে গিয়েই ফিরে এসেছিলেন ?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, ওই সময় আপনি বিশ্বনাথবাবুর ঘরে উঁকি দিয়েছিলেন বা ঢুকেছিলেন কি ?"

"মানে ? আপনি কি আমায় সন্দেহ করেছেন ? চোর ভাবছেন ?" রীতিমত চটে ওঠে শিবপদ।

"না, না, সন্দেহ-টন্দেহর ব্যাপার নয়। স্রেফ রুটিন কোয়েশ্চেন। তা ছাড়া জিনিসটা যে এই ঘর থেকেই গেছে ভাবছেন কেন ?"

"ও ! মানে আমি তাই ভাবলাম। না, আমি দাদুর ঘরের দিকে যাইনি বা ঢুকিনি।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে," পুলক একটু নড়েচড়ে বসে বলল, "আচ্ছা আপনি অ্যাকোয়ারিয়ামে মাছ পুষছেন কদ্দিন ?"

জেরা হঠাৎ হবির প্রসঙ্গে মোড় নিতে শিবু থতমত খেয়ে আমতা-আমতা করল, "অ্যাকোয়ারিয়াম ? মাছ ? তা তিন বছর।"

"মাছ মরেছে কি এর মধ্যে ?"

"হুঁ, মরেছে কয়েকটা।" শিবুর সন্দিগ্ধ ভাব দেখে মনে হল যে, সে ঠিক ঠাওর করতে পারছে না পুলকের উদ্দেশ্য।

পুলক আনমনে গলা, গাল চুলকোতে চুলকোতে বলল, "আমার অ্যাকোয়ারিয়ামে মাছ যে কেন বাঁচছে না, ধরতে পারছি না। দু-দু'বার সব মরে গেল," বলতে বলতেই সে শিবুর দিকে তাকিয়ে গলা পালটে ঈষৎ ব্যঙ্গ-মেশানো স্বরে বলে উঠল, "কী, চিনতে পেরেছেন ? চিচিং ফাঁক।"

জয় সচকিত হয়ে দেখল, শিবু স্তম্ভিত ভাবে পুলকের দিকে চেয়ে আছে।

"কী ব্যাপার ?" কিছু একটা রহস্য আঁচ করে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন বিশ্বনাথবাবু।

"ব্যাপার এই···" পুলক তার বাঁ হাতের চেটোর উলটো দিক মেলে ধরল বিশ্বনাথবাবুর দিকে। জয় দেখল, পুলকের ওই হাতের অনামিকায় একটি আংটি, দেখে মনে হয় সোনার।

এবং তাতে একটি স্বচ্ছ সাদা বড়সড় পাথর বসানো। নিওনবাতির উজ্জ্বল আলোয় ঝকঝক করছে পাথরটা। জয় আগে কখনও পুলকের হাতে কোনও আংটি দ্যাখেনি।

"আরে, এই তো আমার সেই আংটি," বিশ্বনাথবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন।

পুলক আংটিটা খুলে বিশ্বনাথবাবুর হাতে দিল। তিনি সেটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরীক্ষা করে বললেন, "হুঁ, ঠিক তাই। কোথায় পেলে ?"

"বারান্দায় অ্যাকোয়ারিয়ামের ভিতরে," পুলক জবাব দেয়, "শিববাবু এটা চুরি করে ওখানে লুকিয়ে রেখেছিলেন। তাই ওটা আমার হাতে দেখে ভারী অবাক হয়েছেন।"

"মিথ্যে কথা। কী যা-তা বলছেন ?" প্রচণ্ড প্রতিবাদ করে উঠে দাঁড়ায় শিবপদ।

পুলক বাঁকা হেসে বলল, "বসুন শিববাবু, বসুন। উত্তেজিত হয়ে লাভ নেই। আপনার খেয়াল ছিল না যে, সিঁড়ির মুখে সারা রাত একটা বাল্‌ব জ্বলে। আর বারান্দার এই অংশ নীচে মালির ঘর থেকে দেখা যায়।"

"মালির ঘরের উঠোনে তখন কেউ ছিল না, আমি সেটা দেখেছি।" তারস্বরে ঘোষণা করল শিবু।

"বটে, সেটাও লক্ষ রেখেছিলেন ! কিন্তু দুঃখের বিষয়, মালির ঘরের জানলা দিয়ে কেউ আপনাকে দেখে থাকলে অন্ধকারে তা আপনার নজরে না পড়াই স্বাভাবিক। যাক গে, আর মিছিমিছি প্রতিবাদ করে লাভ নেই। আমার কাছে আপনার অপরাধের আরও মোক্ষম কিছু প্রমাণ আছে। দোষ অস্বীকার করলে ব্যাপারটা হয়তো আরও জটিল হবে। আপনার দাদুকে হয়তো পুলিশ ডাকতে বাধ্য করবেন।"

শিবপদ ফ্যাকাশে মুখে কাঠের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

ঘরে কারও মুখে কথা নেই। আওয়াজ বলতে শুধু, খাড়া-হয়ে-বসা বিশ্বনাথবাবুর জোরালো শ্বাস-প্রশ্বাস। তা তাঁর মুখ রাগে টকটকে। মনে হল উনি বুঝি মেরেই বসবেন শিবপদকে।

তবে বিশ্বনাথবাবু সামলে নিলেন নিজেকে। শিবপদকে লক্ষ করে চাপা তীব্র কণ্ঠে কেটে-কেটে উচ্চারণ করলেন, "যাও, বেরিয়ে যাও। গেট আউট। আর, কালকের মধ্যে তুমি এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। তোমার আর মুখদর্শন করতে চাই না। মনে থাকে যেন।"

নতমস্তকে বেরিয়ে গেল শিবপদ।

বিশ্বনাথবাবু খানিক গুম হয়ে রইলেন, তারপর পুলককে বললেন, "তুমি ঠিক ধরেছ, ওই যে অপরাধী সন্দেহ নেই। আমার খুব কৌতূহল হচ্ছে, তুমি বুঝলে কীভাবে ? এমন কী আংটিটা অবধি উদ্ধার করলে, আশ্চর্য !"

পুলক হাসিমুখে বলল, "কৃতিত্বটা অবশ্য আমার একার বলা উচিত হবে না। এর মধ্যে নিশিকান্তবাবুর ভাগও অনেকখানি।"

"নিশিকান্ত ! মানে ?"

"তা হলে একটু গোড়া থেকেই বলি, " বলল পুলক, "আপনার ঘরে আপনি এবং গোবিন্দ ছাড়া আর কারও পায়ের ছাপ স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়নি—। আলমারির লকারে কাঠের বাক্স দুটোতেও আপনার ছাড়া আর কারও আঙুলের ছাপ ছিল না। হয়তো শিবু গ্লাভস পরে এসেছিল। তবে একটা ইমপর্টেন্ট ক্লু পাওয়া যায়, একজোড়া জুতোর ছাপ। খাঁজ কাটা রাবার-সোলের জুতো। গোবিন্দর থেকে জানলাম যে, ওই ধরনের জুতোর মালিক এ-বাড়িতে একজনই। আপনার বড় ছেলে প্রমথবাবু। কাজেই গোড়ায় সন্দেহটা তাঁর দিকেই ঝোঁকে।

"তবু আমার মনে কেমন একটা খটকা লাগে। প্রমথবাবু কি এতই বোকা হবেন যে, চুরি করতে এসে নিজের কাদামাখা জুতোর ছাপ রেখে যাবেন ঘরে ? খালি পায়ে কার্যোদ্ধার করাই তো উচিত। সামান্য বুদ্ধি থাকলেই লোকে অর্থাৎ চোরে তাই করবে। কোথায় যেন গণ্ডগোল। তখনই নিশিকান্তবাবুর আশ্চর্য শ্রবণশক্তির কথা আমার মনে জাগল। প্রথমদিন এসেই খেয়াল করেছিলাম ব্যাপারটা। ঈশ্বর যখন কারও কোনও ইন্দ্রিয় কেড়ে নেন, সাধারণত তখন হতভাগ্যের অন্য ইন্দ্রিয়গুলি অনেক বেশি প্রখর হয়ে ওঠে। নিশিকান্তবাবুরও তাই হয়েছে। গোবিন্দ বলল যে, এই বাড়ির প্রত্যেকের পায়ের শব্দ উনি নাকি চেনেন। ওঁর ঘরের সামনে দিয়ে চেনা কেউ গেলে ঠিক ধরতে পারেন। আর অচেনা কারও পায়ের শব্দ পেলেই, কে যাচ্ছে, প্রশ্ন করা তাঁর স্বভাব।

"গোবিন্দ বলেছিল, হাঁপানির জন্য নিশিকান্তবাবু প্রায়ই রাতে ঘুমোতে পারেন না। তাই ভাবলাম, দেখা যাক এ-রহস্যের কোনও কিনারা উনি দিতে পারেন কি না। আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। নিশিবাবু সোমবার রাতে জেগেই ছিলেন এবং ওঁর ঘরের সামনে দিয়ে রাত সাড়ে-ন'টা দশটার পর তিনজনের যাতায়াতের শব্দ শুনেছেন।

"প্রথমে নিশিবাবু পরপর দু'বার প্রমথবাবুর পায়ের শব্দ শোনেন। প্রথমবার জুতো পায়ে। পরেরবার রাবারের চটি পায়ে। প্রমথবাবু দু'বারই সোজা গিয়ে বাথরুমে ঢুকেছিলেন। তারপর বেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে যান। বাথরুমের দরজায় ছিটকিনি দেওয়া আর খোলার আওয়াজ নিশিবাবুর কান এড়ায়নি।

"এর পর যায় গোবিন্দ। ও সোজা গিয়ে নিজের ঘরে খিল দেয়। ওর খিল দেওয়ার শব্দটা নিশিবাবুর পরিচিত।

"গোবিন্দ চলে যাবার বেশ খানিকক্ষণ বাদে ঘরের সামনে দিয়ে অচেনা পায়ের শব্দ পেয়ে নিশিবাবু যথারীতি প্রশ্ন করেন, 'কে ?' মৃদু স্বরে উত্তর হয়, 'আমি'। শিবপদর গলা। আসলে শিবপদ তখন প্রমথবাবুর বাইরে ছেড়ে রাখা খাঁজকাটা রাবার-সোলের জুতোটা পায়ে গলিয়ে পা টিপে-টিপে আসছিল। তাই তার পদশব্দ নিশিবাবুর কেমন অচেনা ঠেকে।

"শিবপদ কিন্তু তৎক্ষণাৎ বাথরুমে ঢোকেনি। অন্তত মিনিট-দশেক বাদে নিশিবাবু বাথরুমের দরজা বন্ধের আওয়াজ পান। এই সময়টুকুর মধ্যেই শিবপদ আপনার ঘর থেকে আংটি চুরি করে। বাথরুমের দরজা খোলার আওয়াজও হয় খুব তাড়াতাড়ি। শিবপদ ফিরে যায় তেমনি সন্তর্পণে। প্রমথবাবুর জুতো বাইরে যথাস্থানে রেখে সে নিজের ঘরে ঢোকে। প্রমথবাবুর জুতো পায়ে দেবার কারণ, যদি চুরি টের পাওয়া যায়, বিশ্বনাথবাবুর ঘরে জুতোর ছাপ দেখে, দোষটা প্রমথবাবুর ঘাড়েই চাপবে। হয়তো শিবপদর কোনও পুরনো রাগ আছে প্রমথবাবুর ওপর, তাই এক ঢিলে দুই পাখি বধের ফন্দি।"

বিশ্বনাথবাবু চাপা হুঙ্কার ছাড়লেন, "স্কাউন্ড্রেল। বুঝেছি, সেদিন প্রমথর কাছে বকুনি খেয়েছিল, তারই প্রতিশোধ। ও প্রমথর কাছেও টাকা ধার করেছে। শোধ দিচ্ছে না। তাই তাড়া লাগিয়েছে প্রমথ।"

"আপনি বোধহয় জানেন না," বলল পুলক, "শিবপদ জুয়া খেলা শুরু করেছে। এটাই ওর টাকার টানাটানির কারণ।"

ফের খানিকক্ষণ রক্তচক্ষু মেলে ফোঁস-ফোঁস করে বিশ্বনাথবাবু বললেন, "আচ্ছা, সে রাতে নীচে থেকে কেউ কি দেখতে পেয়েছিল শিবুকে আমার ঘরে ঢুকতে?"

"আজ্ঞে না, ওটা আমার একটা চাল," হেসে বলল পুলক, "শিবপদকে ওই বলে ঘাবড়ে দিয়ে দোষ স্বীকার করালাম।"

"কিন্তু আংটিটা উদ্ধার, মানে ওটা যে অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যে লুকোনো ছিল, তুমি বুঝলে কীভাবে?" বিশ্বনাথবাবু থৈ পান না।

"অনুমান এবং আমাদের ভাগ্য," পুলকের জবাব, "সন্দেহটা যখন শিবপদর ওপর দানা বাঁধল, তখন ভাবতে লাগলাম ও আংটিটা নিয়ে কী করেছে? ইতিমধ্যে খোঁজ পেয়েছিলাম যে দোকানের এক পার্টনারের কাছে ওর মোটা টাকা দেনা রয়েছে। কিন্তু এই তিনদিনের ভিতর সে দেনা শোধ হয়নি। ওর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেও এই ক'দিনের টাকা জমা পড়েনি। অতএব আংটি বোধহয় ও এখনও বিক্রি করতে পারেনি। কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। আর আংটি বিক্রি করলেও অতখানি নগদ টাকা কোথায় রাখতে পারে? নিজের ঘরে রাখা বিপজ্জনক। যা কড়া প্রকৃতির দাদু। আংটি মিসিং হয়েছে টের পেলে হয়তো পুলিশেই খবর দেবেন। তখন ঘর সার্চ হবে। দোকানে রাখলে পার্টনারদের চোখে পড়তে পারে। কারও কাছে গচ্ছিত রাখলে জানাজানি হওয়ার সম্ভাবনা। এসব ভাবতে ভাবতেই দুটো জিনিস নজরে এল, বারান্দায় ক্যাক্টাসের টব এবং অ্যাকোয়ারিয়াম।

"প্রত্যেক ক্যাক্টাসগাছের গোড়ায় নানা রঙের নুড়িপাথর জড়ো করা। এইভাবেই সাজায় ক্যাক্টাসটব। টবের মাটি কদাচিৎ খোড়াখুঁড়ির দরকার হয়। অতএব পাথর নাড়াচাড়াও হয় না। মাঝেমধ্যে গাছে ওপর থেকে জল ঢেলে দিলেই যথেষ্ট। অ্যাকোয়ারিয়ামেও রয়েছে প্রচুর ছোট-ছোট পাথর আর বালি। এবং অ্যাকোয়ারিয়ামে শিবপদ ছাড়া আর কেউ হাত দেয় না। সুতরাং ক্যাক্টাসের টবে বা অ্যাকোয়ারিয়ামের পাথর-বালির তলায় আংটিটা লুকিয়ে রাখা যায়। ভাবলাম, দেখি খুঁজে। গোবিন্দকে চা আনতে সরিয়ে দিয়ে এবং জয়কে আপনার ঘরে ছুতো করে আটকে রেখে চটপট খুঁজলাম! প্রথমে ক্যাক্টাসের টবগুলোতে পাথরের ভিতরে। কারণ দায়টা প্রমথবাবুর ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা ছিল। কিন্তু টবে পেলাম না। তখন অ্যাকোয়ারিয়ামের পাথর একটু হাঁটকাতেই আংটি বেরিয়ে পড়ল। লুকোবার আদর্শ জায়গা বটে। চোখের সামনে, অথচ অতি নিরাপদ। কে সন্দেহ করবে ওখানে?"

"তা তখনই বললে না কেন? এত জেরা-টেরার প্রয়োজন কী ছিল?" বিশ্বনাথবাবু যেন কিঞ্চিৎ বিরক্ত।

পুলক বলল, "আমি নিশ্চিত হতে চাইছিলাম। যদি ভুল হয়? যদি নিশিবাবুর কান বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকে? যদি আর কেউ আংটিটা চুরি করে অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যে লুকিয়ে রেখে থাকে?

"আংটিটা আমার বুক-পকেটে ছিল। প্রমথবাবুকে জেরা করতে-করতে এক ফাঁকে আংটি বার করে আমার বাঁ হাতে পরে নিয়ে হাতটা এমনভাবে রাখি, যাতে সেটা প্রমথবাবুর নজরে পড়ে অথচ আপনার বা জয়ের নজরে না পড়ে। লক্ষ করলাম, আংটিটা দেখেও প্রমথবাবুর কোনও বিকার হল না। বুঝলাম উনি নির্দোষ। ফের আংটি ঢুকে গেল আমার পকেটে। শিবপদর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে সেই একই কায়দা করলাম। দেখলেন তো, আংটিটা দেখেই শিবপদ কীরকম চমকে উঠল। একদম থ মেরে গেল। বেশি চালাকি করতে গিয়েই শ্রীমান ফেঁসে গেলেন। খালি পায়ে নিঃশব্দে গিয়ে চুরি করলে হয়তো ও নিশিবাবুর কান এড়াতে পারত।"

"যদি আংটি না পেতে?" এতক্ষণে মুখ খোলে জয়।

পুলক বলল, "তা হলে অন্যভাবে চাপ দিয়ে ওকে দোষ স্বীকার করাতাম। আমার অনুমান যখন খেটে গেছে, তখন ও পার পেত না। কিছু সময় বেশি লাগত এই যা। তবে ইতিমধ্যে আংটিটা বিক্রি করে ফেললে সেটা উদ্ধার করা সম্ভব হত কি না কে জানে।"

বিশ্বনাথবাবু হাত বাড়িয়ে পুলকের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্‌ ইয়াংম্যান। তোমার উন্নতি হোক।"

পুলক স্মিত মুখে বলল, "আমার কাজ শেষ। এবার তা হলে ছুটি?"

"এক মিনিট," বাধা দিলেন বিশ্বনাথবাবু। তিনি তোশকের তলা থেকে একটা ব্যাঙ্কের চেক-বই বের করে বালিশের পাশ থেকে কলম নিয়ে বললেন, "তোমার ফিজ, কত টাকা লিখব?"

"পাঁচশো," জানাল পুলক।

"উঁহু," ঘাড় নাড়লেন বৃদ্ধ। তারপর খসখস করে একটা চেক লিখে পাতাটা ছিঁড়ে পুলকের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এক হাজার দিলাম। তোমার ন্যায্য পাওনা।"

"ধন্যবাদ," পুলক হাসি-মুখে হাত বাড়াল।

ছবি: দেবাশিস দেব

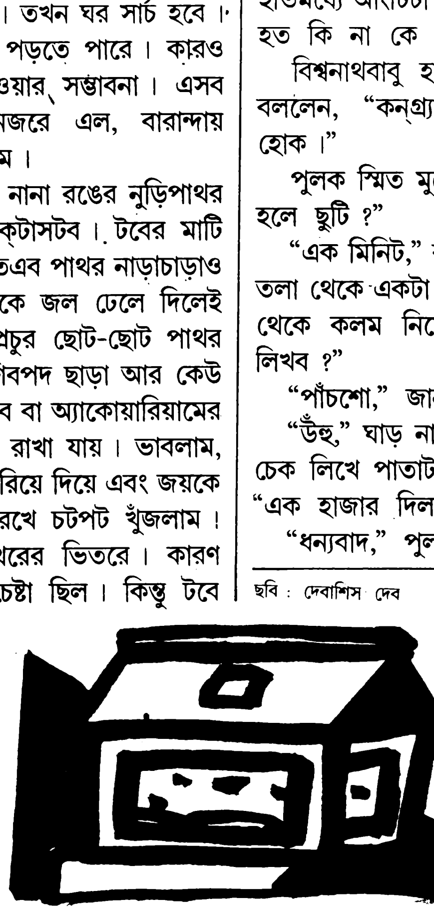

এর মধ্যে কোন কেয়ো-কার্পিন চুলটি আপনার?

চুলের স্টাইল যাই হোক না কেন তার সর্বাঙ্গীন যত্নের জন্যে প্রতিদিন ব্যবহার করুন মৃদু সুরভিত কেয়ো-কার্পিন হেয়ার অয়েল।

চুলের পুষ্টি যোগাবে। চুল থাকবে সুন্দর, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল—অথচ তেলমাখা চটচটে ভাবটি থাকবে না।

আর সেই জন্যেই আপনি স্টাইল পাল্টে পাল্টে দেখতেও পারবেন, কোন স্টাইলে আপনাকে সব থেকে বেশি ভালো লাগে।

কেয়ো-কার্পিন
সুগন্ধী হেয়ার অয়েল

সুস্থ চুল। সুন্দর চুল। কেয়ো-কার্পিন চুল!

১০০ মি·লি· ও ৩০০ মি·লি· শিশিতে পাওয়া যায়। Dey's® যাদের যত্নই আপনার আস্থা

CLARION C-DMHO-7

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদাশিব হৈ হৈ কাণ্ড চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাস

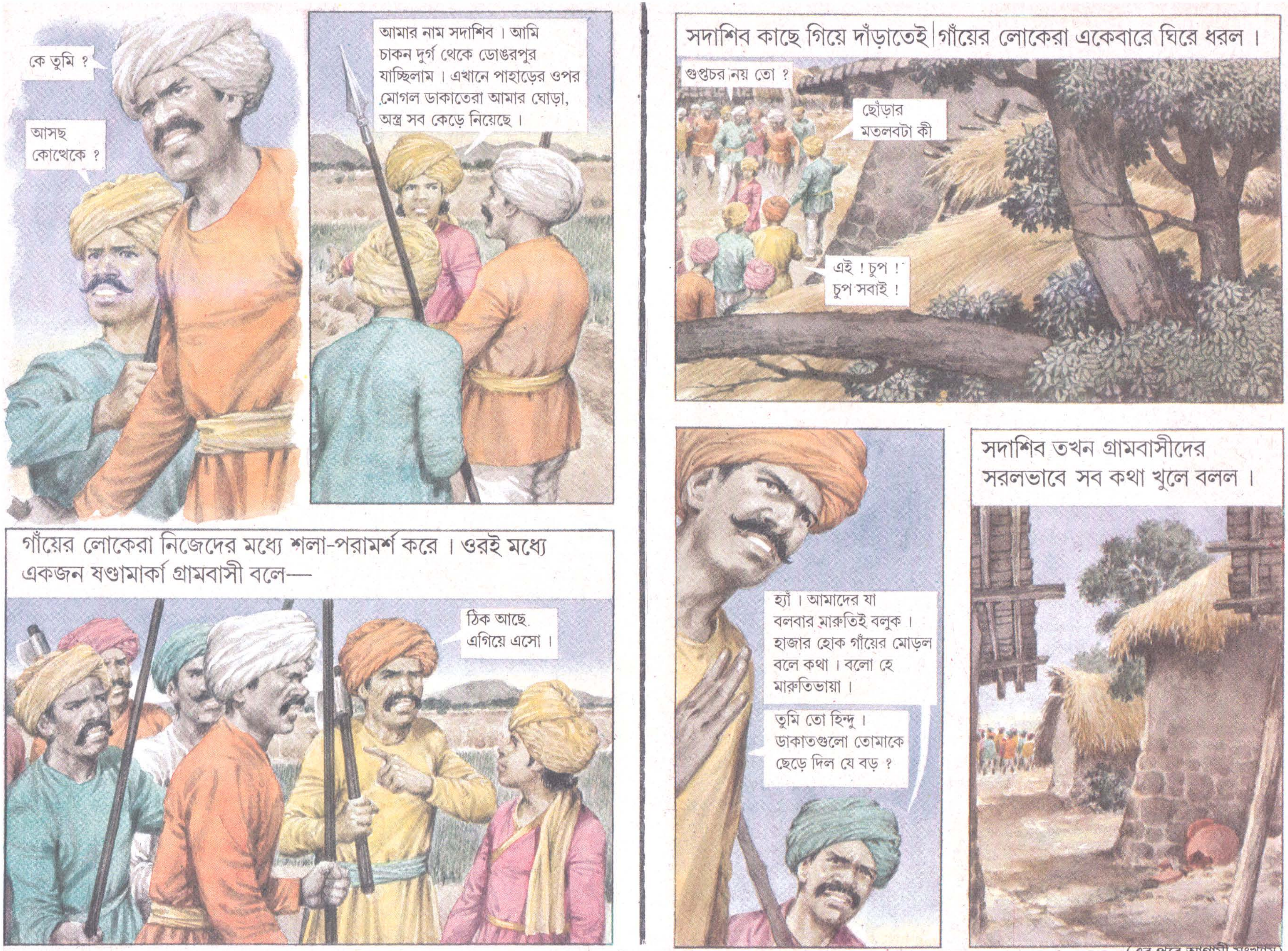

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

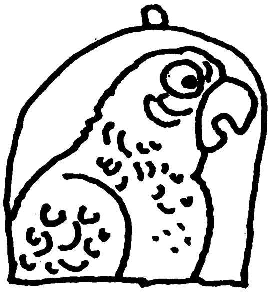

চালাক পাখি

ছেলেবেলা থেকেই রাজুর পাখি পোষার শখ। এখন সে বাড়িতে একটা টিয়াপাখি এনেছে। টিয়াপাখির খাঁচাটা রাজুদের বারান্দায় কাপড় মেলার তারে ঝোলানো থাকে। রাজুদের পাড়ায় প্রায় সবার বাড়িতেই একটা করে পাখি আছে। সকলেই নিজেদের পাখিকে চালাক বলতে চায়। কিন্তু কোনও পাখি এখনও চালাক বলে প্রমাণিত হয়নি।

সেদিন ছিল রবিবার, সারাদিন টুপটাপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল। সন্ধ্যায় বেশ জোরে বৃষ্টি এল। সেদিন জামাকাপড় কিনতে রাজুরা কলকাতায় এসেছিল। ফিরতে রাত হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর আবার বৃষ্টি। তাই তারা তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়েই গভীর ঘুম।

এদিকে পাখিটা বারান্দায় বসে ঝিমোচ্ছিল, হঠাৎ সে দেখল যে, দুটো লোক দরজার সামনে কী যেন করছে। সে ভয় পেয়ে খুব জোরে ডানা ঝাপটাতে লাগল। ফলে মেলার তারটা ঝনঝন করে বেজে উঠল।

চোরদুটো ভাবল পাখির খাঁচাটা নিশ্চয়ই দেওয়ালের কোনও পেরেকের সঙ্গে আটকানো আছে। আর পাখি যখন ডানা ঝাপটাচ্ছে তখন তার ডানা তারে লেগে শব্দ উঠছে। এই ভেবে তারা তারটা কেটে দিল। ফল হল উলটো। খাঁচাটা মাটিতে পড়তেই পাখিটা চেঁচানো আর ডানা ঝাপটানো শুরু করে দিল একসঙ্গে।

এদিকে প্রথমবার তার নড়ার শব্দেই রাজুর বাবার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তখন তিনি ঠিক বুঝতে পারেননি। পরে খাঁচা পড়ে যাওয়ার শব্দ আর পাখির ডাক শুনে মনে করলেন নিশ্চয়ই কোনও বেড়াল পাখিটাকে খাওয়ার চেষ্টা করছে।

তিনি লাঠি নিয়ে বেড়াল মারতে বের হলেন। নীচে এসে দেখেন দুটো চোর দরজার তালা ভাঙছে। তাঁর চিৎকার শুনে আশেপাশের সবাই ছুটে এসে চোরদুটোকে ধরে ফেলল। তারপর তাদের দেওয়া হল থানায়।

এদিকে রাজুর খুব আনন্দ। তার পাখি পাড়ার মধ্যে সবচেয়ে চালাক পাখি। কিন্তু তারপরেই তার ভয় ধরে গেল—পাখিটা খুব চালাক হয়ে গেছে, এবার থেকে সাবধানে আচার চুরি করতে হবে।

অম্লান দত্ত (বয়স ১১)

কুড়ি বছরের বুড়ি

এক যে ছিল বুড়ি,
বয়েস নাকি কুড়ি !
মাথার চুল সাদা
চোখে পড়েছে ছানি—
বয়েস কত বললে
বলে, 'কুড়িই তো জানি।'

দেবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ১০)

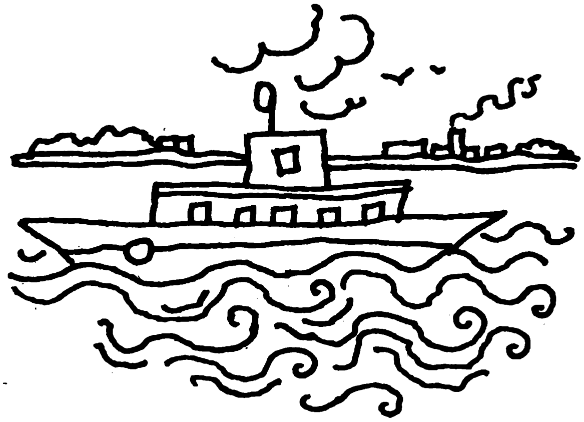

লঞ্চে ভ্রমণ

একদিন দুপুরবেলা আমি, বাবা, মা, দাদা আর ভাই—সবাই মিলে বাবুঘাট থেকে লঞ্চে করে হাওড়ায় এলাম। লঞ্চে চড়তে যে কী মজা সেদিনই টের পেলাম।

শীতের মিষ্টি রোদ পড়ে জলের রঙ চিকচিক করছে। দু-পাশে নানা কল-কারখানা। তারপর সেখান থেকে আর্মেনিয়ান ঘাটে এসে নামলাম।

আর্মেনিয়ান ঘাটটা খুব ভাল লাগল। আমরা সবাই মিলে একটা জায়গায় বসে বিশ্রাম করলাম।

তখন দিনের বেলার সেই মিষ্টি রোদটা প্রায় ফুরিয়ে আসছিল। সেখান থেকে আমরা আবার একটা লঞ্চে চড়ে বাগবাজারের কাশী মিত্রের ঘাটে এসে নামলাম। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

তারপর চক্ররেলে চেপে আবার গঙ্গা দেখতে দেখতে সেই বাবুঘাটে ফিরে এলাম। সেখান থেকে বাসে করে বাড়ি।

চিত্রলেখা ঘোষরায় (বয়স ১০)

ভগবানের খোঁজে

মিহির ভট্টাচার্য

বছরের শেষে পরীক্ষার বার্ষিক ফলাফল বেরোবার পরে বড়দিন আর ইংরেজি নববর্ষ নিয়ে যে ছুটিটা পড়ে সেটাতেই রাজার আনন্দ সবচেয়ে বেশি। নতুন ক্লাস শুরু না হওয়ার আগে পড়াশুনোর নামগন্ধ নেই। বাবা-মা দু'জনেই বলে দিয়েছেন, 'এ সময়টা তোমার নিজের। তুমি সারাক্ষণ খেল, আঁকো, গল্পের বই পড়ো, আমাদের বলার কিচ্ছু নেই।'

কারণটা রাজা বোঝে। স্কুল চলার সময় ওইসব করার এত সময় থাকে না। তখন ফাঁকে-ফোকরে এসব করতে হয়। তবে শীতের এই ছুটিতে রাজার আনন্দের আরেকটা বড় কারণ আছে। এই সময় বাবা-মা'ও অফিস থেকে ছুটি নেন। সারাক্ষণ তাঁদের কাছে পাওয়া যায়। আর ওরা কলকাতার বাইরে বেড়াতে যায়। ওদের বেড়ানোর দলে প্রায়-বছরই যোগ দেন ওর রাঙামামা। রাঙামামা আসলে ওর মেজমামা। ওর মা'র পিঠোপিঠি ভাই। বিয়ে-থা করেননি। সবাই ধরে নিয়েছে, উনি আর বিয়ে করবেন না। তাই সেজমামার বিয়ে হয়ে গেছে। রাঙামামা ছবি আঁকেন। ওঁর চাকরির কাজও তাই। শখে গান করেন। শুনতে খুব ভাল লাগে। মামাবাড়ি বেড়াতে গিয়ে বহু দিন বাঁশির আওয়াজ শুনে রাজা ছাতে গিয়ে দেখেছে রাঙামামা বাঁশি বাজাচ্ছেন।

রাজার মামাবাড়ি চন্দননগরে। গঙ্গার কাছে। বড়মামার ব্যবসা। রাঙা, সেজ আর ছোট, তিন মামাই চাকরি করেন। এঁদের মধ্যে রাঙামামাই বেশি আসেন ওদের খোঁজখবর নিতে। উনি ওর মাকে 'দিদিভাই' বলে ডাকেন। মা রাঙামামাকে এমনভাবে খেতে দেন, বকাঝকা করেন, যেন উনিও রাজার মতোই ছোট।

গত বছর শীতকালে রাঙামামা ওদের সঙ্গে বেড়াতে যেতে পারেননি। ওঁর অফিসে কী যেন কাজ ছিল। এ-বছর নভেম্বরের গোড়াতেই উনি বলে গেছেন, 'দিদিভাই, এবারে আমি আছি।'

বাবা সব গুছিয়ে, আগে থেকে ঠিকঠাক করে বেরোতে ভালবাসেন। মা'র সঙ্গে কয়েক দিন আর রাঙামামার সঙ্গে একদিন কথাবার্তা বলে এবার দিঘায় গিয়ে দিন-কয়েক বিশ্রামের পরিকল্পনা করে ফেললেন। দূর-দূর জায়গার সমুদ্রতীর দেখা হয়েছে, কিন্তু ঘরের কাছের সমুদ্র দেখা হয়নি বলে মা'র আফসোস ছিল। সমুদ্র ছাড়াও সেখানে আছে ঝাউবন।

মা'র বন্ধু কল্যাণীমাসির সাহায্যে দু'রুমের একটা কটেজও জুটে গেল। রাজার মনে আনন্দের শেষ নেই। দিঘায় বেশি দৌড়-ঝাঁপ নেই। বাবা বলেই দিয়েছেন, 'এবার শুয়ে-বসে বিশ্রাম।' তার মানে রাঙামামার কাছ থেকে শোনা যাবে গল্পের পর গল্প। এছাড়া কখনও কখনও সমুদ্রতীরে বা নির্জন পথে গলা ছেড়ে গান গেয়ে উঠবেন তিনি। সঙ্গে যোগ দেবেন মা। কোনও কোনও সময় বেজে উঠবে ওঁর বাঁশির সুর।

রাঙামামার গল্পগুলোর মধ্যে রাজার সব থেকে মজা লাগে

'কালুর দাদুর গল্প' শুনতে। মা বলেন, 'পচা গপ্পো।' ক্লাস ফাইভে ওঠার পর রাজা অবশ্য বুঝতে পারে রাঙামামার গল্পের কালুর দাদুর কাণ্ডকারখানা অনেকটাই অসম্ভব, বানানো। তবু শুনতে মজা লাগে।

গল্প, গান আর বাঁশির ফাঁকে-ফাঁকে সুযোগ আসে রাঙামামার কাছে অজস্র প্রশ্ন করার। ওর প্রশ্নের ঠেলায় ওর মা-বাবা অনেক সময় একটু-আধটু বিরক্ত হলেও রাঙামামা কক্ষনো হন না। সব জিজ্ঞাসার উত্তর দেন। না জানা থাকলে বলেন, 'জানা নেই রে! জেনে নিয়ে তোকে বলব।'

দিঘার বাসে রাঙামামা আর রাজা পাশাপাশি বসল। হাওড়ার ঘিঞ্জি এলাকা পেরিয়ে বাস যখন ফাঁকা রাস্তায় পড়ল তখন জানলার কাঁচের ভেতর দিয়ে গাছপালা, মাঠ, গোরু-ছাগল, খেত, মানুষজন, বিরাট আকাশ এসব দেখতে দেখতে রাজার ক'দিন আগে স্কুলে অরিজিতের সঙ্গে ঝগড়ার কথাটা মনে পড়ে গেল। মরাল সায়েন্সের একটা গল্প নিয়ে কথা বলার সময় রাজা বলেছিল, 'ভগবানকে চাইলে দেখতে পাওয়া যায়।'

অরিজিৎ ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছিল, 'ধুর, ভগবান বলে কিছু নেই।'

'হ্যাঁ! তুই জানিস!' রাজাও ছেড়ে দেয়নি।

'আমার বাবা বলেছে।' অরিজিৎ গম্ভীরভাবে জানিয়ে দিল।

অরিজিতের বাবা বলেছে শুনে রাজা থতমত খেয়ে গেছে। ও কোনও কথা বলতে পারেনি। আবার পুরোপুরি মেনে নিতেও পারেনি। সেজন্য ফাদার প্রিফেক্ট যেদিন ওদের বাড়িতে এসেছিলেন সেদিন উনি চলে যাওয়ার আগে ও ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'ফাদার, ভগবান আছেন, না?'

ফাদার সুন্দর করে হেসে ওর মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, 'ওহ্ শিওরলি, মাই সন। তিনি সর্বেত্রি আছেন।'

সে সময় ও নিশ্চিন্ত হয়েছিল। অরিজিতের বাবা ফাদারের চেয়ে বেশি জানেন না। কিন্তু পরে ওর মনে হয়েছে, ভগবানকে দেখা যায় কি না তা জিজ্ঞেস করা হয়নি। ফাদারকে স্কুলে আর প্রশ্ন করার সাহস রাজার হয়নি। ও ঠিক করে রেখেছিল বাবাকে বা রাঙামামাকে জিজ্ঞেস করবে। এখন বাসে যেতে-যেতে ওর সে-কথা মনে পড়ল।

"আচ্ছা রাঙামামা, ভগবানকে কি দেখতে পাওয়া যায়?"

রাঙামামা স্নেহভরে ওর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, "নিশ্চয়ই!"

"তুমি দেখেছ?"

"হ্যাঁ!"

"দেখেছ! আমাকে দেখাবে?"

"যে-কোনও জায়গায় কী দেখানো যায়! তার জন্য সেরকম জায়গা আর সময় চাই।"

"দিঘায় দেখা যাবে?"

"ওখানে গেলে বোঝা যাবে।"

পুরনো দিঘায় বাস থেকে নেমে দুটো রিকশো নিয়ে ওরা নতুন দিঘার দিকে গেল। সেখানেই ওদের কটেজ। পুরনো দিঘার ভিড় কাটিয়ে এগোতেই রাঙামামা মুগ্ধ চোখে ঝাউয়ের বন, ডান দিকের উঁচু-নিচু জমি আর সুন্দর সাজানো বাংলো, বাড়িঘর, হাসপাতাল দেখে "অপূর্ব, অপূর্ব" বলতে লাগলেন। জায়গাটা রাজারও খুব সুন্দর লাগল।

কটেজে পৌঁছে সকলেই খুব খুশি। সাজানো-গোছানো সুন্দর জায়গা। কটেজগুলোর নাম সব 'অ' দিয়ে। ওদেরটা প্রথম সারির একদম শেষে। নাম 'অপরূপা'। কোনও রকমে জিনিসপত্তর রেখে ওরা খাবার হোটেলের খোঁজে বার হল। কটেজের পাশের রাস্তা দিয়েই সামান্য এগোলেই একটা হোটেল। সেখানে খেয়ে নিয়ে 'অমরাবতী' পার্কে একটা চক্কর মেরে ওরা সোজা হেঁটে ঝাউবনের ভেতর দিয়ে সমুদ্রের তীরে এল। সেখানে পৌঁছে মা বললেন, "আমি আর হাঁটতে পারছি না বাপু।"

সমুদ্রের ধারে ওরা বসে পড়ল। রাজার শুধু-শুধু বসে থাকতে ভাল লাগে না। ওর ইচ্ছে করল দৌড়ে গিয়ে সমুদ্রের জলে পা ভেজাতে। কিন্তু ওর পায়ে জুতো। উপায় নেই। তবে সমুদ্রের ধারে খানিকটা হাঁটা যায়। ও রাঙামামাকে অস্থির করে তুলল। তিনি মাকে বললেন, "দিদিভাই, তোমরা বোসো। আমরা খানিকটা ঘুরেই আসি।"

রাজা আর রাঙামামা হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্রের জলের একদম ধারে চলে গেল। এখান থেকে পশ্চিম দিকে সোজা গেলে ওড়িশার সীমান্ত। পায়ে হেঁটে যাওয়া যায়। জলের ধারে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রাঙামামা ওকে নিয়ে আবার হেঁটে চললেন। রাজা ভাবল, ওরা ওড়িশার বর্ডারে যাবে। বর্ডার ব্যাপারটা কী রকম তা দেখার জন্য ওর খুব কৌতূহল। অনেকটা পথ গিয়ে বেশ কিছু নৌকো, মাছ ধরার জাল আর জেলেদের একটা দল ওরা দেখতে পেল। বাঁ দিকে সমুদ্র আর ডান দিকে ছোট পাহাড়ের মতো বালির ঢিবি। খাড়াই। প্রথম বালির ঢিবিটা পার হতেই দেখা গেল একটা পায়ে-চলা পথ ঢুকে গেছে পেছনের ঝাউবনে। সেখান থেকে একজন জেলে আর ওর বয়সী একটা ছেলে বেরিয়ে এল। রাজা কৌতূহলী হয়ে রাঙামামাকে জিজ্ঞেস করল, "ওরা কোত্থেকে এল?"

"ওদিকে জেলেদের বসতি আছে।"

"যাবে?"

"এখন থাক। তোর মা হয়তো ছেলের চিন্তায় বসতেই পারছে না।"

সেটা ঠিক। মা ওর সবকিছু নিয়ে বড্ড বেশি ভাবেন। মা'র একটুও সাহস নেই। অথচ রাজা কোনও কিছুকেই ভয় পায় না।

দিঘা রাজার কাছে একদিনেই খুব মজার মনে হল। সন্ধেবেলা ওদের পাশের কটেজের লোকদের সঙ্গে খুব আলাপ হল। ওঁরা তিনজন এসেছেন। টুকাই আর ওর মা-বাবা। টুকাই রাজার চেয়ে এক ক্লাস উঁচুতে পড়ে। ওরা দু'জন চাদর মুড়ি দিয়ে বারান্দায় বসে তেলেভাজা মুড়ি খেতে-খেতে খুব জমিয়ে রাঙামামার কাছে 'কালুর দাদুর গল্প' শুনে ফেলল। গল্পের শেষে রাজার মনে পড়ল রাঙামামা বলেছিলেন দিঘায় ভগবান দেখা যেতে পারে। ও তাঁকে টুকাইয়ের সামনেই বলল, "রাঙামামা, এখানে ভগবান দেখা যাবে তো?"

রাঙামামা হেসে বললেন, "মনে হচ্ছে দেখা যাবে। তবে দু-একদিন সময় লাগবে।"

রাজা টুকাইকে বলল, "তুমি দেখবে ভগবান? তা হলে খুব মজা হবে।"

টুকাই অবাক হয়ে রাঙামামার দিকে তাকিয়ে রইল।

ভগবান দেখা যাবে !

পরদিন সকালবেলা রাজাদের কটেজে হৈ-চৈ । মা বলছেন, "খোকন কোথায় গেল বলো তো ! চা করে ওকে ডাকতে গিয়ে দেখি ঘরে নেই !"

বাবা বললেন, "অত চিন্তা করছ কেন ? ওকে তো জানো ।"

রাজা ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসে মাকে জিজ্ঞেস করে শুনল কাকভোরে উঠে রাঙামামা কোথায় যেন বেরিয়ে গেছেন। সবাই অনেকক্ষণ উদ্বেগে কাটাবার পর আটটা নাগাদ উনি হাসিমুখে ফিরে এলেন । মা রেগেমেগে জিজ্ঞেস করলেন, "তুই কিছু না বলে ভোর-ভোর কোথায় গিয়েছিলি ?"

রাঙামামা তেমনি হাসিমুখেই বললেন, "সত্যি দিদিভাই ! তোকে নিয়ে আর পারি না ! আমি কি রাজা ? আমি গিয়েছিলাম এখানে ভগবান কোথায় থাকে তার খোঁজে । রাজাকে দেখাতে হবে না ?"

রাজার মন আনন্দে, উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল । ও বলল, "তুমি খোঁজ পেয়েছ রাঙামামা ?"

"হ্যাঁ ! কাল খুব ভোরে উঠতে হবে ।"

"তা হলে টুকাইকে বলে রাখি !"

"এখন থাক । কী করতে হবে সন্ধেবেলা সব বলব ।"

রাজার ধৈর্য ধরছিল না । খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরবেলা ওরা ওড়িশার বর্ডারে গেল । সেখান থেকে ভেতরে ঢুকে চন্দনেশ্বর শিবের মন্দির দেখে এল । বর্ডার দেখে ও হতাশ হল । আলাদা কিছু বোঝাই গেল না । মজা হল রিকশোয় করে চন্দনেশ্বর যেতে-আসতে । সবকিছুর মধ্যে ঘুরে-ফিরে পরের দিন সকালে ভগবান দেখার ব্যাপারটা ওর মাথায় পাক খেতে থাকল । ও বারবার ভাবতে থাকল স্কুল খুললে গল্পটা অম্লান, অভীক, কৌশিক, সন্দীপ আর রাজুকে কী রকম জমিয়ে বলা যাবে !

সন্ধেবেলা কটেজের বারান্দায় বসে রাঙামামা বললেন, "খুব ভোরে একটু-একটু অন্ধকার থাকতে উঠে পড়বি । দিদিভাই, জামাইবাবু আর টুকাইয়ের বাবা-মা তোদের নিয়ে যেখানে ভগবানকে দেখা যাবে, সেখানে যাবে ।"

"আর তুমি ?"

"ভগবান তো আড়ালে থাকে । সকলের সামনে আসে না । আমি আগে গিয়ে দেখব এসেছে কি না ।"

টুকাই অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বলল, "তাই কি হয় নাকি ! ভগবান যেন মানুষ !"

"কাল সকালেই বুঝতে পারবি ।"

রাজা রাঙামামার কথা অবিশ্বাস করতে পারল না, আবার টুকাইয়ের কথাগুলোও ও ফেলতে পারল না ।

সেদিন রাত্রে রাঙামামার পাশে শুয়ে ভগবান দেখার ব্যাপারটা নিয়ে অজস্র চিন্তা রাজার মাথায় ভিড় করলেও ও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করল না । কিন্তু একটা বিষয় ওকে খুবই চিন্তায় ফেলল, ওর আর টুকাইয়ের সঙ্গে কথা বলার পর বড়রা বারান্দায় বসে কথা বলেছেন । ও আর টুকাই তখন কটেজ কম্পাউণ্ডের সরু রাস্তায় পায়চারি করে নিজেদের মধ্যে গল্প করছিল । ও লক্ষ করেছে অন্য সবাইকে রাঙামামা চুপি-চুপি খানিকক্ষণ কী যেন বললেন । তারপর বাবা স্নেহের দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন । রাজার মনে হল, ওঁরা কোনও

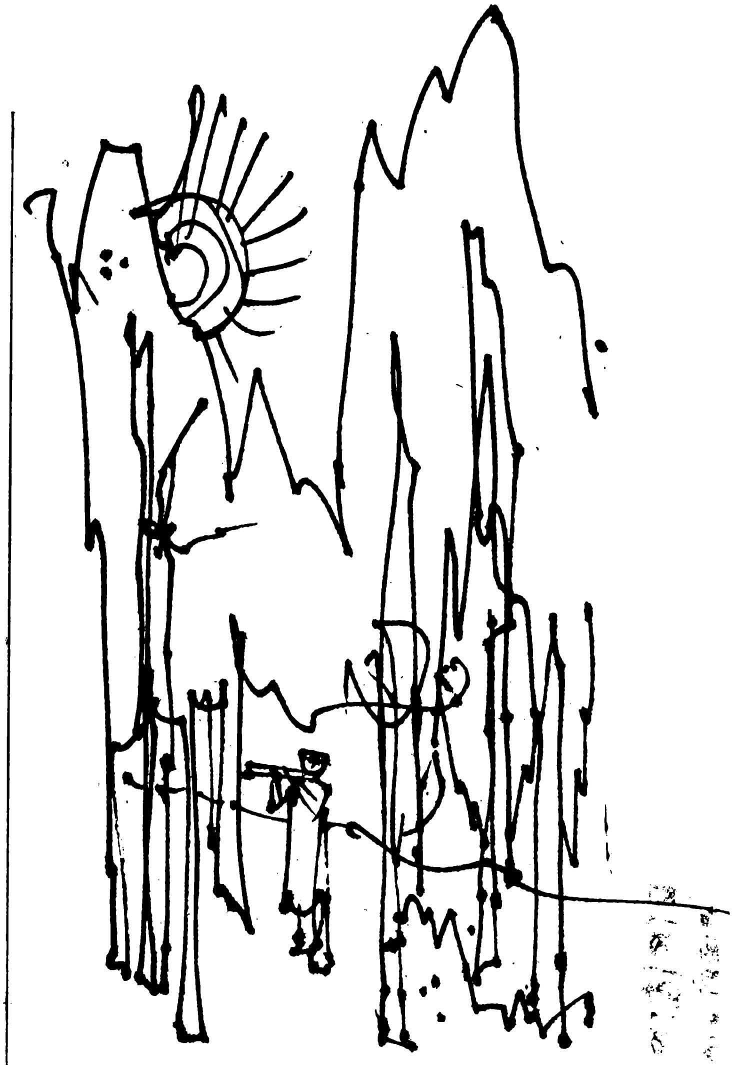

চালাকি করছেন । ও মনে-মনে ভাবল, আমি ঠিক ধরে ফেলব ।

পরদিন প্রায় অন্ধকার থাকতেই রাজা উঠে পড়ল । টুকাইরাও উঠে পড়েছে । রাঙামামাও ওঠার আগেই বেরিয়ে গেছেন । ওরা সবাই যখন বার হল তখন দিনের আলো ফুটেছে কিন্তু সূর্য ওঠেনি । চারদিকে নিস্তব্ধতা । বড় রাস্তায় বেরিয়ে দেখল অনেক দূরে একটা মাত্র লোক । সমুদ্রের দিকে যাওয়ার পথের ধারে চায়ের দোকানগুলো সবে ঝাঁপ খুলছে । ঝাউবনের দিকে এখনও অন্ধকার-অন্ধকার । চারদিকে পাতলা কুয়াশা । ঘাসে, ফুলে, গাছের পাতায় শিশিরের ছোঁয়া । রাজার মনে দারুণ আনন্দ হল । ঝাউবনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গাছে-গাছে পাখির ডাক শুনতে পেল ।

সমুদ্রতীরে কিছু লোকের ভিড় হয়েছে। ওরা সকলে পশ্চিম দিকে হাঁটতে লাগল । টুকাই নতুন নতুন ঝিনুক দেখে কুড়োতে গেল । ওর মা বললেন, "দেরি হয়ে যাবে । ভগবান দেখা যাবে না ।"

টুকাই অবাক হয়ে ওর মা'র দিকে তাকল । ওর মা'ও তা হলে বিশ্বাস করেন, ভগবান দেখা যাবে !

ওরা হাঁটতে হাঁটতে সেই বালির পাহাড়ের কাছে এল । সেখানে ওরা বাঁধানো পাড়ে উঠল । রাজার বাবা বললেন, "তোমরা দুজনে ওই বালির পাহাড়ের মাথায় উঠে সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়াও । আমরা আসছি ।"

রাজা আর টুকাই হৈ-হৈ করে উঠতে শুরু করল । পেছন

ডাক্তারবাবু বলছেন

বসন্তের অসুখবিসুখ

আগেই বলেছি, বসন্তকালের আবহাওয়া মৃদু ঠাণ্ডা মৃদু গরম, সেইজন্যে রোগের জীবাণু আকাশে-বাতাসে খুব উড়ে বেড়ায়। তোমরাও খুব হৈ-হল্লা করে বসন্তকালে ঘুরে বেড়াবে আর দুম করে অসুখে পড়ে যাবে, সেটা ঠিক নয়।

অসুখে পড়ার প্রধান কারণ হল এই সময় আবহাওয়া ঠাণ্ডা-শুকনো থাকে, তাই রোজ স্নান করতে ইচ্ছে করে না। গা-হাত-পা শুকনো থাকলে ভাইরাস বা বাতাসবাহিত জীবাণুগুলো সহজেই শরীরে ঢুকে যেতে পারে। সেইজন্যে বসন্তকালে রোজ স্নান করতে হবে। স্নান করার আগে একটু গরম তেল নিয়ে ভাল করে সমস্ত শরীরে মাখবে। এই তেল মাখার সময় শরীরের খানিকটা ব্যায়াম হয়ে যাবে, ফলে শরীরের কোষগুলো সতেজ ও সক্রিয় হয়ে উঠবে, তা ছাড়া গায়ে তেল মাখলে সারা শরীর মসৃণ থাকবে আর জীবাণুগুলো চামড়ার ওপর বসে বাসা বাঁধতে পারবে না।

এ ছাড়া দু'নাকের ফুটোয় একটু করে তেল দিয়ে দেবে। নাকের সামনেটা তেলে ভিজে থাকলে ভাইরাস বা জীবাণু নিশ্বাসের সঙ্গে নাকের মধ্যে এলেও, নাকের সামনের তেলে আটকে যাবে, নাকের মধ্যে ঢুকতে পারবে না, ফলে রোগব্যাধির আশঙ্কাও থাকবে না।

বসন্তকালে যে শুধু বসন্ত রোগ হয়, তা নয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা সর্দি-জ্বর গা-হাত-পায়ে ব্যথাও হতে পারে। রোজ সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে ব্যায়াম করবে, অথবা একশো মিটার দৌড়বে। ব্যায়াম করলে বা দৌড়োদৌড়ি করলে শরীরের কোষ সতেজ থাকবে, সমস্ত শরীরে খুব ভালভাবে রক্ত চলাচল করবে, ফলে শরীরের জীবাণুনাশক শক্তি বেড়ে যাবে।

লেখাপড়াও রোজ করবে। কীভাবে পড়তে হবে এ-কথা তো আগেই বলা হয়েছে। রোজ নিয়মিতভাবে পড়লে দেখবে পড়া কেমন সহজেই হয়ে যাচ্ছে, আর সমস্ত পড়াই মনে থাকছে। পরীক্ষার সময় আর রাত জেগে পড়তে হবে না।

খাওয়াদাওয়ার কথা আগেই বলেছি, কিছুটা বলা বাকি আছে, এখানেই বলে নিই। বসন্তকালে মাছ-মাংস না খাওয়াই ভাল। মরা মাছ বা মাংসে জীবাণু অথবা ভাইরাস খুব তাড়াতাড়ি জন্ম নেয় এবং বংশবৃদ্ধি করে। বাজার থেকে যে মাছ-মাংস আমরা কিনি, তার মধ্যে যে এইসব জীবাণু নেই কে বলতে পারে! সেইজন্য বসন্তকালে নিরামিষ খাওয়াই ভাল। মাছ যদি খেতেই হয়, জ্যান্ত ছোট মাছ বাজার থেকে কিনে তার ঝোল খাবে। বড় মাছ বা মাংস এ-সময়ে এড়িয়ে চলাই ভাল। ডিম খেতে পারো, আপত্তি নেই।

বসন্তকালে খালি গায়ে থাকবে না। যদিও মনে হয় খালি গায়ে থাকতে খুব ভাল লাগে, তবু হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যাবার ভয় থাকে, তাই একটা সুতোর জামা সবসময়ে পরে থাকবে। গেঞ্জি পরবে না। গেঞ্জি শরীরের সঙ্গে টান-টান হয়ে থাকে, সেইজন্যে রক্ত চলাচল ঠিকমতো হয় না। শুধু জামা পরবে।

(ডাঃ) বিশ্বনাথ রায়

থেকে মা'র কথা ভেসে এল, "ওরা দু'জনে পারবে?"

বাবা বললেন, "আমি পেছন-পেছন উঠছি।"

রাজা আর টুকাই উঁচু বালির পাহাড়ের মাথায় উঠে পড়ল। ওরা একটু হাঁফিয়ে গেছে। ওদের থেকে সামান্য পিছিয়ে রাজার বাবা। টুকাইয়ের মা-বাবা, রাজার মা ওদের অনেক নীচে একটা ঢিবির ওপর একটা ঝাউগাছের গোড়ায় সমতল জায়গায় বসে পড়েছেন।

রাজা আর টুকাই সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল পাতলা কুয়াশা হালকা ধোঁয়ার মতো হয়ে গেছে। দূরে সমুদ্রের জল ঘেঁষে ডিমের কুসুমের মতো লাল গোলাকার সূর্য আকাশে ভেসে উঠেছে। সমুদ্রের জল সোনালি আলোয় চিক-চিক করছে। ওরা মুগ্ধ হয়ে গেল। এখানে চারদিক নির্জন। কোনও মানুষ নেই। অনেক দূরে সমুদ্রতীরে মানুষগুলো দাঁড়িয়ে আছে, যেন পুতুল। আরও দূরে সমুদ্রের বুকে ছোট জেলে-নৌকোগুলো সব খেলনা। ওদের বাঁ দিকের বন থেকে নানান পাখির কিচিরমিচির আওয়াজ ভেসে আসছে। পাখিদের মেলা বসেছে।

"এবার বাঁ দিকে দ্যাখো," রাজার বাবার গলার স্বর যেন আকাশ থেকে ভেসে এল।

বাঁ দিকে তাকিয়ে রাজা আর টুকাই দেখল, বালির পাহাড়টা অনেক নীচে নেমে গেছে। সেখানে অনেক গাছের জঙ্গল। সেখানে অনেক রকমের পাখি ডেকে-ডেকে নেচে-নেচে এ-গাছ থেকে ও-গাছে ঘোরাফেরা করছে। সোনালি সূর্যের আলো এসে পড়েছে সেই জঙ্গলে। পাতলা ধোঁয়ার মতো কুয়াশা তাকে আরও রহস্যময় করে তুলেছে।

ঘুরে দাঁড়ানোর পর ওদের বাঁ ধারে পড়েছে উঁচুনিচু জমির ওপর এক বিরাট ঝাউবন। রাজা সেদিকে তাকিয়ে বুঝল বালির পাহাড়ের শেষে যে রাস্তা ও আর রাঙামামা দেখেছিল, সেটা এই বনেই ঢুকেছে। ঝাউবনের ফাঁকে ধোঁয়ার মতো পাতলা কুয়াশা স্থির হয়ে আছে, পাতা আর গাছের সরল কাণ্ডের ফাঁক দিয়ে সোনালি সূর্যের আলো তার উপর পড়েছে। এই আলো-আঁধারি রঙরূপের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওরা নিজেদের হারিয়ে ফেলল। এমন সময় কোথা থেকে বাঁশির একটা পাগল-করা সুর ভেসে এল। রাজা সেই সুর অনুসরণ করে তাকিয়ে দেখল, একটা সাদা আবছা মূর্তি গাছের ফাঁকে-ফাঁকে মিলিয়ে যাচ্ছে। ও আর টুকাই প্রকৃতির এই রূপ আর বাঁশির ওই মধুর সুরের স্বপ্নলোকে নিজেদের সবকিছু ভুলে গেল। এমন সময় মা'র গলা ভেসে এল, "এবার তোমরা নেমে এসো।"

ওপর থেকে নেমে সমুদ্রতীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে রাজা আর টুকাই বারবার ভাবল ওই সাদা মূর্তিটাই কি ভগবান?

ওরা যখন পুলিশ হলিডে হোমের সুন্দর বাড়িটার কাছাকাছি এসেছে তখন হঠাৎ পাশ থেকে চমকে দিয়ে রাঙামামা প্রশ্ন করলেন, "কী রে, দেখলি ভগবান?"

রাঙামামার পরনে সাদা পায়জামা, সাদা পাঞ্জাবি আর একটা সাদা চাদর। হাতে বাঁশি। রাজা আর টুকাই যখন হৈ-হৈ করে বলতে যাবে "আমরা বুঝতে পেরেছি" তখন রাঙামামার কথাগুলো যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এল, "প্রকৃতির এই নির্মল সুন্দর রূপের নামই ভগবান।"

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

সিলভার ব্লেজ

সার আর্থার কোনান ডয়েল

আগে যা ঘটেছে : রেসের ঘোড়া 'সিলভার ব্লেজ' আস্তাবল থেকে উধাও। ঘোড়াটির দেখাশোনা করবার ভার ছিল মিঃ স্ট্রেকারের উপরে, আর আস্তাবল যারা পাহারা দিত, তাদেরই একজনকে, তার নাম হাণ্টার, খাবার পৌঁছে দিতে যাচ্ছিল এডিথ। পথে যে-লোকের সঙ্গে এডিথের দেখা হয়, আস্তাবলে পৌঁছে সে বলে, সিলভার ব্লেজ হেরে যেতে পারে। তাই শুনে হাণ্টার তাকে তাড়া করে যায়। মিঃ স্ট্রেকার মধ্যরাতে আস্তাবলে এসেছিলেন। পরদিন এক ঝোপে আবিষ্কৃত হয় তাঁর মৃতদেহ। ডান হাতে রক্তমাখা সরু-ফলা ছুরি, বাঁ হাতে রেশমি টাইয়ের টুকরো। টাই সেই এডিথের দেখা রহস্যময় লোকটির। পুলিশের বিশ্বাস, সে-ই খুনি। লোকটির নাম সিমসন। ব্লেজ হারলে তার লাভ আছে। হোমস ব্লেজের মালিককে বলে, রেসের দিনে ব্লেজ দৌড়বেই। ব্লেজের পায়ের ছাপ সে দেখেছে ; জেনেছে, কোন্ আস্তাবলের দিকে গেছে ব্লেজ। কিন্তু সেই আস্তাবলে কেন ব্লেজকে পায়নি পুলিশ ? হোমস বলল, 'আমরা আজ লণ্ডনে ফিরে যাব।' তারপর···

ইন্সপেক্টর চোখ বড়-বড় করে তাকালেন। কর্নেলের মুখে একটা চাপা বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল। কর্নেল বললেন, "তা হলে স্ট্রেকারের খুনিকে ধরবার আশা আপনি ছেড়ে দিচ্ছেন।"

হোমস খানিকটা নাচারভাবে কাঁধ ঝাঁকাল, খুনিকে ধরবার ব্যাপারটা অত সহজ নয়। তবে আমার বিশ্বাস, আপনার ঘোড়া মঙ্গলবার দৌড়বে। আপনি শুধুমাত্র আপনার জকিকে তৈরি থাকতে বলবেন। আমাকে কি জন স্ট্রেকারের একটা ফোটোগ্রাফ দিতে পারেন ?"

ইন্সপেক্টর তাঁর কোটের পকেট থেকে একটা ফোটোগ্রাফ বের করে দিলেন।

"মিঃ গ্রেগরির কাছে চাওয়া মাত্র জিনিসটি পাওয়া যায় দেখছি। আপনারা যদি একটু অপেক্ষা করেন তো ভাল হয়। আমি ওই কাজের মেয়েটির সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে চাই।

হোমস ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই কর্নেল বেশ রূঢ়ভাবে বললেন, "নাহ্, আমাদের লণ্ডনের গোয়েন্দামশাইয়ের কাজকর্মে আমি সত্যিই খুব হতাশ হয়েছি। আমি তো দেখছি উনি আসবার আগে আমরা যেখানে ছিলুম, এখনও সেখানেই আছি।"

আমি বললুম, "কিন্তু হোমস তো আপনাকে কথা দিয়েছে যে আপনার ঘোড়াটা পাওয়া যাবে।"

কর্নেল অবজ্ঞার ভাব দেখিয়ে বললেন, "উনি কথা না দিয়ে ঘোড়াটাকে এনে হাজির করলে আমি বেশি খুশি হতুম।"

আমি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলুম, এমন সময় হোমস ঘরে ঢুকল।

"চলুন, আমরা এখন ট্যাভিস্টকের দিকে যাই।"

আমরা গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতেই আস্তাবলে একটি ছেলে এসে গাড়ির দরজা খুলে দিল। হঠাৎ হোমসের কী খেয়াল হল, সে ছেলেটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার আস্তাবলে ভেড়া আছে নিশ্চয়ই ! সেগুলোর দেখাশোনা কে করে ?"

"আজ্ঞে আমি করি।"

"আচ্ছা, ভেড়াগুলোর কি কোনও অসুখ-বিসুখ করেছে ?"

"না। তবে তিনটে ভেড়া খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটছে।"

আমি দেখলুম হোমসের খুব স্ফূর্তি হয়েছে। সে হাত ঘষতে-ঘষতে হাসতে লাগল।

আমার হাতে ছোট্ট একটা চড় মেরে হোমস বলল, "ওয়াটসন, স্রেফ আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছিলুম। গ্রেগরি, ভেড়াদের এই অসুখটার দিকে আমি তোমাকে একটু মন দিতে বলছি।··· ওহে, গাড়ি ছাড়ো।"

কর্নেলের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, তিনি শার্লক হোমসের কার্যকলাপে মোটেই খুশি হতে পারেননি। কিন্তু ইন্সপেক্টরের মুখ-চোখ দেখে মনে হল, তিনি বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন।

"ব্যাপারটা আপনি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন ?" গ্রেগরি জিজ্ঞেস করলেন।

"খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।"

"এ ছাড়া আর বিশেষ কোনও কিছুর দিকে নজর দিতে বলছেন ?"

"সেই রাত্রে কুকুরটার অস্বাভাবিক ব্যবহারটা বিবেচনা করুন।"

"সেই রাত্রে কুকুরটা তো কিছু করেনি।"

হোমস বলল, "সেইটাই তো অস্বাভাবিক।"

ঠিক চারদিন পরে আমি আর হোমস আবার ট্রেনে করে চললুম। এবার আমরা যাচ্ছি উইনচেস্টার। সেখানে ওয়েসেক্স কাপের দৌড় হবে। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল যে কর্নেল রস স্টেশনের বাইরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন। তাঁর চোখ-মুখ গম্ভীর। কথাবার্তায় একটা ছাড়া-ছাড়া ভাব।

"আমি এখনও আমার ঘোড়ার সন্ধান পাইনি।" কর্নেল বললেন।

"আপনি আপনার ঘোড়াকে দেখে চিনতে পারবেন বলে আশা করি।"

হোমসের কথায় কর্নেল দারুণ চটে গেলেন, "আমি বিশ বছর ধরে এই নিয়ে আছি। আমাকে কখনও কেউ এরকম প্রশ্ন করতে সাহস করেনি। সিলভার ব্লেজকে দেখলে একটা ছোট ছেলেও চিনতে পারবে। কপালে সাদা দাগ আর সামনের পায়ে ছিট-ছিট দাগ আছে।"

"সিলভার ব্লেজের বাজার কেমন ?"

"কাল পর্যন্ত ভাল ছিল। কিন্তু আজ দাম পড়ে গেছে।"

হোমস বললে, "ভেতরের খবরটা কেউ জানে বলে মনে হচ্ছে।"

আমরা যখন গ্রাণ্ডস্ট্যাণ্ডে আমাদের বসবার জায়গায়

গেলুম, তখন দেখলুম ওয়েসেক্স কাপে যে-সব ঘোড়া ছুটবে তাদের নামের লিস্ট টাঙানো রয়েছে :

১। মিঃ হিথ নিউটনের দ্য নিগ্রো (লালটুপি, দারচিনি রঙের জামা)
২। কর্নেল ওয়ার্ডলয়ের পিউজিলিস্ট (গোলাপি টুপি, নীল, কালো জামা।)
৩। লর্ড ব্যাকওয়াটারের ডেসবরো (হলদে টুপি, লম্বা হাতা)
৪। কর্নেল রসের সিলভার ব্লেজ (কালো টুপি, লাল জামা)
৫। ডিউক অব বালমোরালের আইরিশ (হলদে-কালো ডোরা)
৬। লর্ড সিঙ্গলফোর্ডের র‍্যাসপার (কালচে-লাল টুপি, কালো হাতা)

"আপনার কথার ওপর ভরসা করে আমাদের অন্য ঘোড়াটার নাম কাটিয়ে দিয়েছি কিন্তু। আরে এ কী, সিলভার ব্লেজ জিতবে বলে লোকে এখনও বলাবলি করছে।"

গেটের মুখে কিছু লোক কোন্ ঘোড়ার জেতার সম্ভাবনা কী রকম, তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল।

আমি বললুম, "ওই যে এবার নম্বর লাগিয়ে দিচ্ছে। ছ'টা নম্বরই আছে।"

কর্নেল বললেন,"যাক, তা হলে আমার ঘোড়া ছুটছে। কিন্তু আমার ঘোড়া কই ?" বুঝলুম, কর্নেল ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন।

"এই তো পাঁচটা বেরোল। তা হলে ছ'নম্বর ঘোড়াটাই আপনার ঘোড়া হবে।" আমার কথা শেষ হবার আগেই একটা সুন্দর তেজী ঘোড়া টগবগ করতে করতে বেরিয়ে এল।

কর্নেল চিৎকার করে বলে উঠলেন, "এটা আমার ঘোড়া নয়। এটার গায়ে একগাছি সাদা চুল নেই। এ আপনি কী করছেন, মিঃ হোমস।"

একটুও না ঘাবড়ে হোমস বলল, "ব্যস্ত হবেন না। এ এখন কেমন ছোটে দেখা যাক।" তারপর আমার ফিল্ড গ্লাসটা চেয়ে নিয়ে হোমস দেখতে লাগল। "বাঃ বাঃ, দারুণ ছুটছে তো। এইবার বেঁকছে··· দারুণ!"

আমরা যেখানে বসে ছিলুম, সেখান থেকে এখন ঘোড়াগুলোকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। ছ'টা ঘোড়া পাশাপাশি এক লাইনে ছুটছিল। আমার মনে হল, একটা চাদর ছুঁড়ে দিলে ঘোড়াগুলো চাপা পড়ে যাবে। একটু পরেই কর্নেলের ঘোড়া সব ঘোড়াকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। সিলভার ব্লেজ ডেসবরো আর ডিউক অব বালমোরালের ঘোড়া আইরিশকে অনেক পেছনে ফেলে দৌড়ের শেষ মুখে পৌঁছে গেল।

কর্নেল রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, "যাক্, দৌড়ে আমি জিতেছি। কিন্তু আমি তো এ-সবের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। মিঃ হোমস, আপনি কি দয়া করে সব খোলসা করে বলবেন ?

"নিশ্চয়ই। তার আগে চলুন একবার ঘোড়াটাকে দেখে আসি।"

যেখানে ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে ছিল আমরা সেখানে গেলুম। হোমস বলল, "আপনি এর মুখ আর সামনের পা স্পিরিট দিয়ে ধুয়ে ফেললেই দেখবেন যে, এই আপনার সিলভার ব্লেজ।

"আপনার কথা শুনে তো মাথা ঘুরে যাচ্ছে।"

"আমি একে যার কাছে যে অবস্থায় পাই, সেই ভাবেই ছোটাবার ব্যবস্থা করি।"

"আপনি তো মশাই ম্যাজিক দেখালেন। ঘোড়াটা খুব যত্নে ছিল বলে তো মনে হচ্ছে। এর আগে ঘোড়াটা এত ভালভাবে কখনও দৌড়য়নি। দেখুন, আমি আপনাকে ভুল বুঝেছিলুম, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। মিঃ হোমস, ঘোড়াটাকে খুঁজে বের করে আপনি আমার মস্ত বড় উপকার করেছেন। এখন স্ট্রেকারের খুনিকে , যদি ধরতে পারেন তো আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।"

"আমি তো তাকে ধরে ফেলেছি," হোমস আস্তে-আস্তে বলল।

আমি আর কর্নেল আশ্চর্য হয়ে হোমসের দিকে তাকালুম। "আপনি তাকে ধরে ফেলেছেন ! কই কোথায় ?"

"সে এখানেই আছে।"

"এখানে ? কোথায় ?"

"আমাদের কাছাকাছি আছে।"

রাগে কর্নেলের মুখ লাল হয়ে গেল। "আপনি আমার খুবই উপকার করেছেন মিঃ হোমস। কিন্তু তাই বলে আপনি আমাকে অপমান করলে সেটা আমি বরদাস্ত করব না।"

হোমস হেসে উঠল। "না, না, খুনের সঙ্গে আপনার কোনও সম্পর্ক নেই। খুনি হচ্ছেন এই ইনিই," বলে হোমস ঘোড়াটার পিঠে হাত বুলিয়ে দিল।

"ঘোড়াটা খুনি !" আমি আর কর্নেল রস একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম।

"হ্যাঁ। ঘোড়াটাই খুনি বটে। তবে জন স্ট্রেকারকে ও খুন করেছে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে। তাই ওকে খুনের দায়ে দায়ী করা যাবে না কোনওমতেই। জন স্ট্রেকার অত্যন্ত খারাপ ধরনের লোক ছিলেন। ওঁকে বিশ্বাস করাটাই আপনার ভুল হয়েছিল।···যাই হোক, এই বাজিগুলো শেষ হোক, তখন সব কথা বলব।"

সন্ধেবেলা আমরা লণ্ডনের ট্রেনে চাপলুম। হোমসের কথা শুনতে শুনতে কীভাবে যে সময় কেটে গেল, আমরা বুঝতেই পারিনি।

"গোড়াতেই বলি, খবরের কাগজ পড়ে ব্যাপারটা সম্বন্ধে যে ধারণাটা আমার হয়েছিল, সেটা একদম ভুল। খবরের কাগজে যে সব সত্যি মিথ্যে কথা ছাপা হয়েছিল, তার মধ্যে আসল কথাটা একদম চাপা পড়ে গিয়েছিল। ডেভনশায়ারে যাবার সময় আমার মনে হয়েছিল যে, ফিটসরয় সিমসনই অপরাধী। যদিও এটা জানতুম যে, তার বিরুদ্ধে জোরালো কোনও প্রমাণ নেই।

"মনে আছে বোধহয়, ল্যাণ্ডো করে যাবার সময় স্ট্রেকারের বাড়ির সামনে গাড়ি থামলে আপনারা সবাই নেমে পড়েছিলেন। আমি গাড়ির ভেতরে বসে ছিলুম। আসলে তখনই আমার কাছে সব জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে যায়।, আর আমি অবাক হয়ে ভাবছিলুম যে, এত বড় সূত্রটা আমার চোখ এড়িয়ে গেল কেমন করে। সে সূত্রটা হল মাটনকারি।"

কর্নেল বললেন, "আমি কিন্তু এখনও মাটনকারির সূত্রের তাৎপর্যটা ধরতে পারিনি।"

"আমার বিশ্লেষণের পদ্ধতিতে এইটেই প্রথম ধাপ বলতে পারেন। আফিমগুঁড়োর একটা স্বাদ আছে। সাধারণভাবে কোনও খাবারের সঙ্গে মেশালেই তার গন্ধটা ধরা পড়বেই। আর তখনই যাকে সেটা খেতে দেওয়া হবে, সে আর খাবে না। মাটনকারি হচ্ছে সেই ধরনের রান্না, যাতে আফিম মেশালে তার গন্ধটা আর টের পাওয়া যাবে না। তা যদি হয়

তবে ফিটসরয় সিমসনের পক্ষে কীভাবে জানা সম্ভব যে, সেই দিন আস্তাবলের ছেলেদের জন্যে মাটনকারি রান্না হবে ? সিমসনের পক্ষে একথা জানা একেবারেই অসম্ভব। তা হলে সিমসনকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে হয়। তখন সন্দেহটা গিয়ে পড়ে স্ট্রেকার আর তাঁর স্ত্রীর ওপর। কেননা, সেই রাতে মাটনকারি রান্না হবে কি না এটা তাঁরাই ঠিক করেছেন। হান্টারের জন্যে যে তরকারিটা আলাদা করে রাখা হয়েছিল সেই ডিশটাতেই আফিম মেশানো হয়েছিল। তা হলে বাড়ির কাজের মেয়েটির অজান্তে কার পক্ষে ওই ডিশে আফিম মেশানো সম্ভব ?

"কে এ-কাজ করে থাকতে পারে, এটা ঠিক করতে গিয়ে আর-একটা ব্যাপার আমার চোখে পড়ল। সেটা হল, সেই রাতে আস্তাবলের কুকুরটা চুপচাপ ছিল। যদি একটা সঠিক সিদ্ধান্ত করা যায় তো তার থেকে আরও অনেক সিদ্ধান্ত করা সম্ভব। সিমসনের ব্যাপারটা থেকে আমি জানতে পারি যে, আস্তাবলে একটা কুকুর থাকে। রাত্তির বেলায় কেউ ঘোড়াটাকে আস্তাবল থেকে বের করে নিয়ে গেল অথচ কুকুরটা ডাকল না কেন ? কুকুরটা ডাকাডাকি করলে তো আস্তাবলের আরও দুটো ছেলের ঘুম ভাঙত। তা হলে সেই রাত্তিরে এমন একজন কেউ আস্তাবলে এসেছিল যাকে কুকুরটা চেনে।

"আমি তখন মোটামুটিভাবে নিশ্চিত যে, জন স্ট্রেকারই রাতে আস্তাবলে আসেন আর ঘোড়াটাকে বের করে নিয়ে যান। কিন্তু কী জন্যে ? নিশ্চয়ই কোনও বদ মতলবে তিনি এ-কাজ করেছেন তা না হলে কেন তিনি যে-ছেলেটি আস্তাবলে পাহারা দিচ্ছিল তাকে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেবেন। কিন্তু উদ্দেশ্যটা তখনও আমি ধরতে পারিনি। অবশ্য ঘুষ খেয়ে কখনও-সখনও ঘোড়ার ম্যানেজার যে নিজের ঘোড়া যাতে না দৌড়তে পারে, সে কাজ যে করেনি তা নয়। এটা কী করে হয়, জকিকে ঘুষ দিয়ে, না হয় অন্য কোনও উপায়ে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে জন স্ট্রেকার কোন্ উপায় নিতে চেয়েছেন ? আমার মনে হল যে, স্ট্রেকারের জামা-প্যান্টের পকেট পরীক্ষা করে দেখলে একটা হদিস পাব।

"হলও ঠিক তাই। আপনাদের নিশ্চয়ই সেই ছুরিটার কথা মনে আছে। স্ট্রেকারের হাতের সেই ছুরিটা দেখে ওয়াটসন বলেছিল যে, ওই ধরনের ছুরি ডাক্তারবাবুরা অপারেশন করবার সময় ব্যবহার করেন। হ্যাঁ, সেই রাতে খুব একটা সূক্ষ্ম অপারেশন করবার জন্যই ওই ছুরিটা নেওয়া হয়েছিল। কর্নেল রস, আপনি তো বহুদিন ঘোড়া নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, ঘোড়ার পায়ের একটা বিশেষ উপশিরা সামান্য একটু ছড়ে দিলেই ঘোড়া সামান্য খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটবে। বাইরে থেকে কিছু বোঝা যাবে না। মনে হবে ঘোড়াটা বোধহয় অতিরিক্ত পরিশ্রমে কাহিল হয়ে পড়েছে।"

"পাজি ! শয়তান !" কর্নেল চেঁচিয়ে উঠলেন।

"ঘোড়াটাকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার দরকার হয়েছিল এই কারণে যে, আস্তাবলের মধ্যে ওই কাজ করতে গেলে ঘোড়ার চিৎকারে আস্তাবলের ছোকরাদের ঘুম ভেঙে যেত।"

"ওহ্, আমি কিছুই ধরতে পারিনি। সেই জন্যেই শয়তানটা সঙ্গে দেশলাই আর মোমবাতি নিয়ে গিয়েছিল।"

"ঠিক তাই। স্ট্রেকারের জিনিসপত্র পরীক্ষা করতে গিয়ে আমি বুঝতে পারলুম কেন তিনি এ কাজ করতে গিয়েছিলেন। আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই, স্ট্রেকারের পকেটে কতগুলো বিল পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটা ডার্বিশায়ার বলে একজনের নামে। আমরা নিজেদের বিল মেটাতেই হিমশিম খেয়ে যাই, আর স্ট্রেকার অন্যের বিল রেখে দিয়েছেন ? আমার তখনই সন্দেহ হয়। মিসেস স্ট্রেকারকে গার্ডেন পার্টির গল্প ফেঁদে ওই পোশাকটার কথা জেনে নিলুম। ওই পোশাক ওঁর নেই। তা হলে ? এর উত্তর পেলুম লণ্ডনের সেই দোকানে। স্ট্রেকারের ফোটো দেখাতেই ওরা ওঁকে ডার্বিশায়ার বলে চিনতে পারল। তারপর সব কিছুই সহজ হয়ে গেল।

"স্ট্রেকার ঘোড়াটাকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। কুকুরের তাড়া খেয়ে সিমসন যখন পালাচ্ছিল তখন ওর টাইটা পড়ে যায়। স্ট্রেকার সেটা দেখতে পেয়ে কুড়িয়ে নেন। তিনি ঠিক করেছিলেন, ওইটে দিয়ে ঘোড়াটার পা বাঁধবেন। তারপর ডোবার মধ্যে ঘোড়াটাকে নিয়ে নামেন। অন্ধকারে ফশ করে দেশলাই জ্বালতে ঘোড়াটা ভয় পেয়ে যায়। জন্তুরা অনেক জিনিস টের পায়। স্ট্রেকারের হাবভাবে ও কিছু টের পেয়েছিল নিশ্চয়ই। তাই স্ট্রেকার ওর কাছে যেতেই ঘোড়াটা চাঁট ছুঁড়তে থাকে। লোহার নাল-লাগানো পায়ের এক মোক্ষম চাঁটেই স্ট্রেকার মারা পড়েন। কী, সব পরিষ্কার হল তো ?"

"হ্যাঁ। এমন ভাবে বললেন যে, মনে হল ঘটনাগুলো আপনার চোখের সামনেই ঘটেছে।"

"আর ভেড়ার ব্যাপারটা আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছিলুম। আমার মনে হয়েছিল, স্ট্রেকার যেরকম ঘড়েল মানুষ, তাতে এ-কাজ করবার আগে তিনি হাত পাকিয়ে নিতে চাইবেন। ভেড়াই হল এ-কাজে হাত পাকাবার সবচেয়ে উপযুক্ত জন্তু। তাই ভেড়ার দিকে নজর পড়াতে আমি ছেলেটির কাছে ভেড়াদের কুশল সংবাদ জানতে চাই।"

"আপনি সব সমস্যারই তো সমাধান করলেন। ঘোড়াটা কী ভাবে পেলেন সেটা বলুন।"

"স্ট্রেকারকে আঘাত করে ঘোড়াটা পালিয়ে যায়। আপনারই একজন প্রতিবেশী ঘোড়াটাকে রেখে দেয়। ও ব্যাপারটা ভুলে যান।...আর মিনিট-দশেকের মধ্যে আমরা পৌঁছে যাব। এর পর আপনার যদি আর কিছু জানবার থাকে তো সেটা আমাদের ফ্ল্যাটেই হবে।"

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

শার্লক হোমসের নতুন গোয়েন্দা-গল্প

হলদে মুখ

আগামী সংখ্যায় শুরু হচ্ছে

ধাঁধা

“এবারের ধাঁধাটা হল একাই একশো, বুঝলে সতুবাবু ?” ছোট্‌কা একটা খাম দেখিয়ে বলল আমায়।

আলমারি খুলে একটু আগেই খামটা বার করেছে ছোট্‌কা। অনেকগুলো খুচরো টাকা যে খামটায় রয়েছে, তাও স্পষ্ট বোঝা গেছে। কেননা, সেই খুচরোগুলোই আমার দিকে পিছন ফিরে গুনে ফেলল ছোট্‌কা। তারপর কী-যেন ভেবে নিয়ে, পকেটের মানিব্যাগ থেকে কিছু টাকা বার করে খামটায় রাখল, খাম থেকেও দু-চারটে নোট বার করে নিল। এখন বুঝতে পারছি, আসলে এতক্ষণ ধরে একটা ধাঁধাই সাজাচ্ছিল ছোট্‌কা।

খামটা টেবিলের উপর রেখে দিল ছোট্‌কা। বাইরে থেকে বোঝার জো নেই, খামটায় এখন ঠিক কত টাকা রয়েছে। ঠিক যে কত টাকা সেটা অবশ্য ছোট্‌কাই বলে দিল। বলল, “এই খামটায় রয়েছে একশো টাকা। সবই খুচরো নোটে। পাঁচ টাকার, দু’টাকার আর এক টাকার নোটে। কীভাবে রয়েছে সে-হিসেবটাও বলে দিচ্ছি। দু’টাকার নোট যতগুলো, তার দশগুণ রয়েছে এক টাকার নোট, বাকিটা রয়েছে পাঁচ টাকার নোট। সব মিলিয়ে রয়েছে একশো টাকা। তোমাকে একটু ভেবেচিন্তে বার করতে হবে, খুচরো নোটের হিসেবটা কী দাঁড়াচ্ছে।” ছোট্‌কা একটু হেসে ফের বলল, “এই ধাঁধাতেই পুরো একশো নম্বর।”

তা, একশো নম্বরের এই ধাঁধাটাই হোক এবারের প্রথম ধাঁধা। ফাউ হিসেবে থাক, সহজতর দু’খানা।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ বেমানান কোন্‌টি ? অর্ক, মার্তণ্ড, আদিত্য, হুতাশন, সবিতা, বিভাবসু

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—

দাঠাকুলানর

গতবারের উত্তর ॥ (১) চেকটা যেহেতু তিনশো টাকার সামান্য বেশি ছিল, তাই বলা যায়, ৩১২ টাকারই চেক হবে। কেননা, ১, ২ ও ৩—এই তিন সংখ্যার যোগফল ও গুণফল এক। এ দিয়ে ৩২১ও লেখা যায়। কিন্তু ৩১২ ও ৩২১-এর মধ্যে সামান্য বেশি বলতে ৩১২ টাই বুঝব আমরা। (২) বানাই। (৩) ভোজনবিলাসী।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

১		২		৩		৪
		৫	৬			
	৭				৮	
৯					১০	১১
১২					১৩	
১৪				১৫		

সংকেত : পাশাপাশি : (১) গুণ-অঙ্ক করার আগে শিখতে হয়। (৩) নির্ভীকতা। (৬) অকপট। (৭) যোগান। (৯) মধ্য এশিয়ার প্রাচীন জাতিবিশেষ। (১০) রামের দ্বিতীয় পুত্র। (১২) তনুত্রাণ। (১৩) ধাঁধা। (১৪) প্রকার বা ধরন। (১৫) নিকৃষ্ট কাঁসা।

উপর-নীচ : (১) প্রাচীন পঞ্চবটী। (২) যা দিয়ে হরেক খেলা আর হরেক ম্যাজিক। ১৩) বৎসর। (৪) নক্ষত্রপুঞ্জবিশেষ। (৬) কালিদাস-রচিত মহাকাব্য। (৭) যে-ক্রিয়ার কর্ম আছে। (৮) বলরাম। (৯) ব্যাধ। (১১) বাঁধন।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

রা	জ	শে	খ	র	ব	সু
স		র		হ		ভা
বি		পা	র	স্য		ষ
হা	হা		স		বা	চ
রী	তি		র		ম	ন্দ্র
বো			চ			ব
স	ত্যে	ন্দ্র	না	থ	ব	সু

রঞ্জন

মজার খেলা

সতেরোটা পোড়া দেশলাইকাঠি বা টুথপিক দিয়ে নীচের ছবির মতো একটা ভুল অঙ্ক টেবিলের উপর সাজাও—

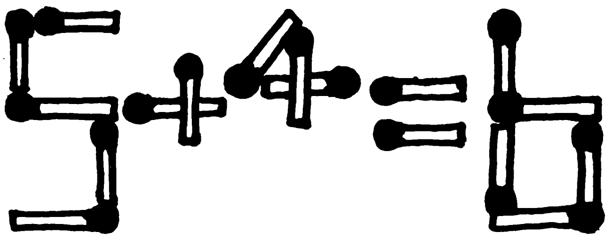

কী লেখা হল বলো তো ? লেখা হল, ৫+৪=৬ । এবারে, একটা কাঠিকে এক জায়গা থেকে সরিয়ে ফের অন্য জায়গায় বসিয়ে, এই ভুল অঙ্কটাকে সঠিক অঙ্কের চেহারা দিতে হবে ।

তোমাদের অনেকের হয়তো মনে পড়বে, গত ২২ জানুয়ারির আনন্দমেলায় এই রকমই একটা সমস্যা দেওয়া হয়েছিল । ঠিকই ধরেছ । কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, সেবারে যে সমাধানটা করে দেখানো হয়েছিল, সেটা কিন্তু একটা কাঠি সরিয়ে করা যায় না, করতে হয় দুটো কাঠি সরিয়ে । সেই ভুলটুকু ঠিক করে নিয়ো । আর তার বদলে সত্যি-সত্যি একটা কাঠি সরিয়ে এই সমস্যাটার কীভাবে উত্তর করা যায়, সেটাই করে দেখব আমরা ।

কীভাবে হবে ভাবছ ?

না, এবারে আর পাঁচকে দুই বানানো নয় । ছয়কে নয় বানানো ।

নীচের ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে—

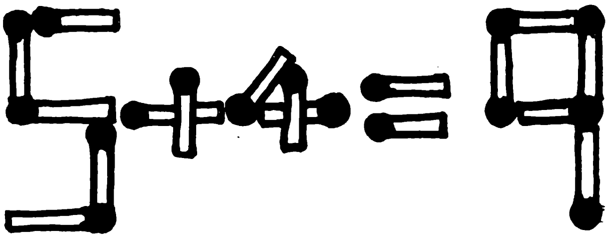

কী, একটা কাঠিই সরল তো ?

মজারু

হাসিখুশি

"ওয়েটার, আমার প্লেটে এটা কী দিয়েছ ?"

"কাটলেট, স্যার ।"

"যখন বানানো হয়েছিল তখনকার কথা বলছি না, বলছি এখনকার কথা ।"

"কালেকটিভ নাউনের একটা উদাহরণ দিতে পারো তোতন ?"

"পারি স্যার, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ।"

"কারও মুখ একবার দেখলে আপনি চিনে রাখতে পারেন ?"

"তা পারি । কিন্তু কেন বলো তো ?"

"আপনার আয়নাটা আমি ভেঙে ফেলেছি ।"

"বলো তো বুবুন, রবিহুনহুড কেন শুধু ধনীদেরই টাকাপয়সা ডাকাতি করত ?"

"গরিবদের টাকাপয়সা নেই বলে ।"

"পাখি কেনাবেচার ব্যবসা করে টাকা জমিয়ে একটা বাড়ি বানিয়েছি । একটা জুতসই নাম দিতে পারো বাড়িটার ?"

"চিড়িয়াখানা ।"

"হাতির নাকি স্মৃতিশক্তি খুব বেশি, কিছুই ভোলে না ?"

"কী করে বলব ? আমি তো হাতির সঙ্গে কখনও কোনও কথা বলিনি ।"

"মাস্টারমশাই কালকে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, স্কুলে পড়তে আসার বয়েস হয়েছে আমার এমন কোনও ভাইবোন আছে কি না ।"

"তুমি বাবা-মার একমাত্র ছেলে শুনে তিনি কী বললেন ?"

"বললেন, 'হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম !'"

ছবি : দেবাশিস দেব

আমরা চার, এই আমাদের সুখী পরিবার!

আমাদের বিয়ের মাত্র দু'মাস পরেই পরিবারে প্রথম সদস্য এল···এক ঝকৃঝকে নতুন গোদরেজ। তার কয়েক বছর পরেই তো দীপক জন্মাল। সোনামণি এখন ১২'য় পা দিয়েছে। আমাদের এই সুখী পরিবারে চার জনায় মিলে, কি মজায় দিন কাটাচ্ছি হেসে-খেলে।

গোদরেজের দিকে যখন তাকাই, তখন ওকে অগাধ আস্থার আপনজনা ভিন্ন আর কিছু ভাবতেই পারি না।

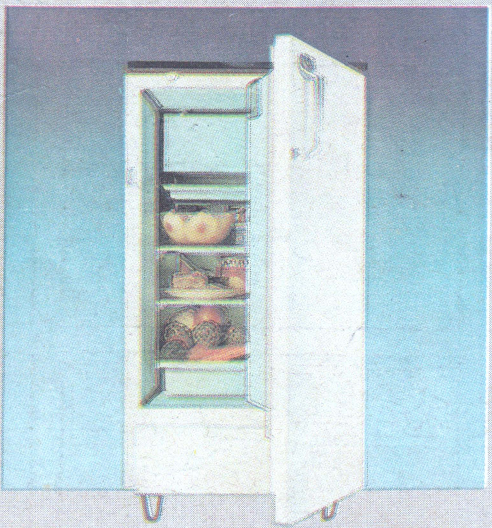

এই স্বনামধন্য রেফ্রিজারেটর এমন সুনিপুণ যত্নে তৈরী, যা বছরের পর বছর চমৎকার চলে, পাই-পয়সাটিরও উশুল লাভ দিয়ে চলে। বংশ-পরম্পরায় সকলে এই আপনজনের বিশ্বস্ত সেবা উপভোগ করে। সুতরাং, গোদরেজ যখন নিয়ে যান, আমরা জানি বহুকালভোর, বাঁধল আমাদের মধুর মিলনডোর।

আপনাদের বিশ্বস্ত

Godrej® রেফ্রিজারেটর

উৎকৃষ্ট টেকনিকের ফলশ্রুতি...
বহুকাল চমৎকার চলার প্রতিশ্রুতি!

GBM-2032

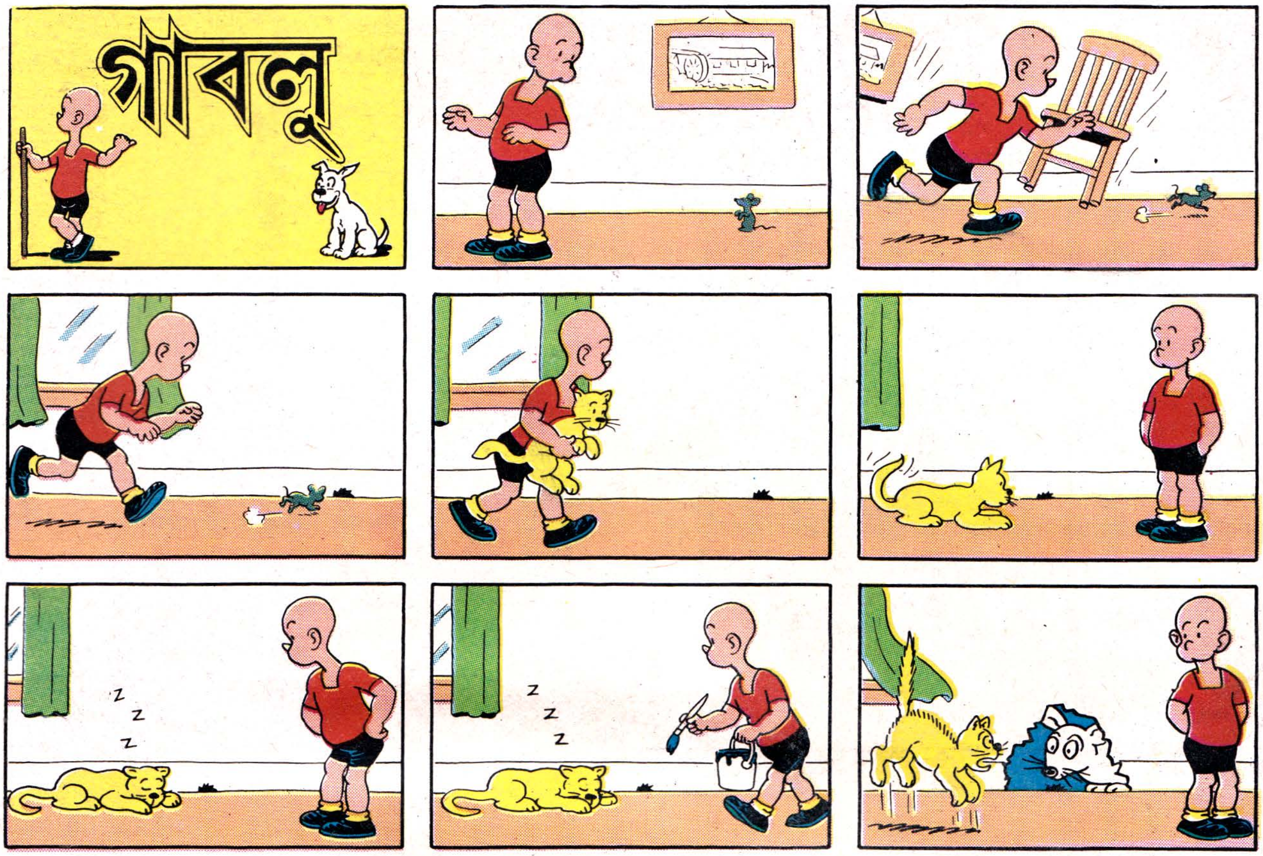
গাবলু

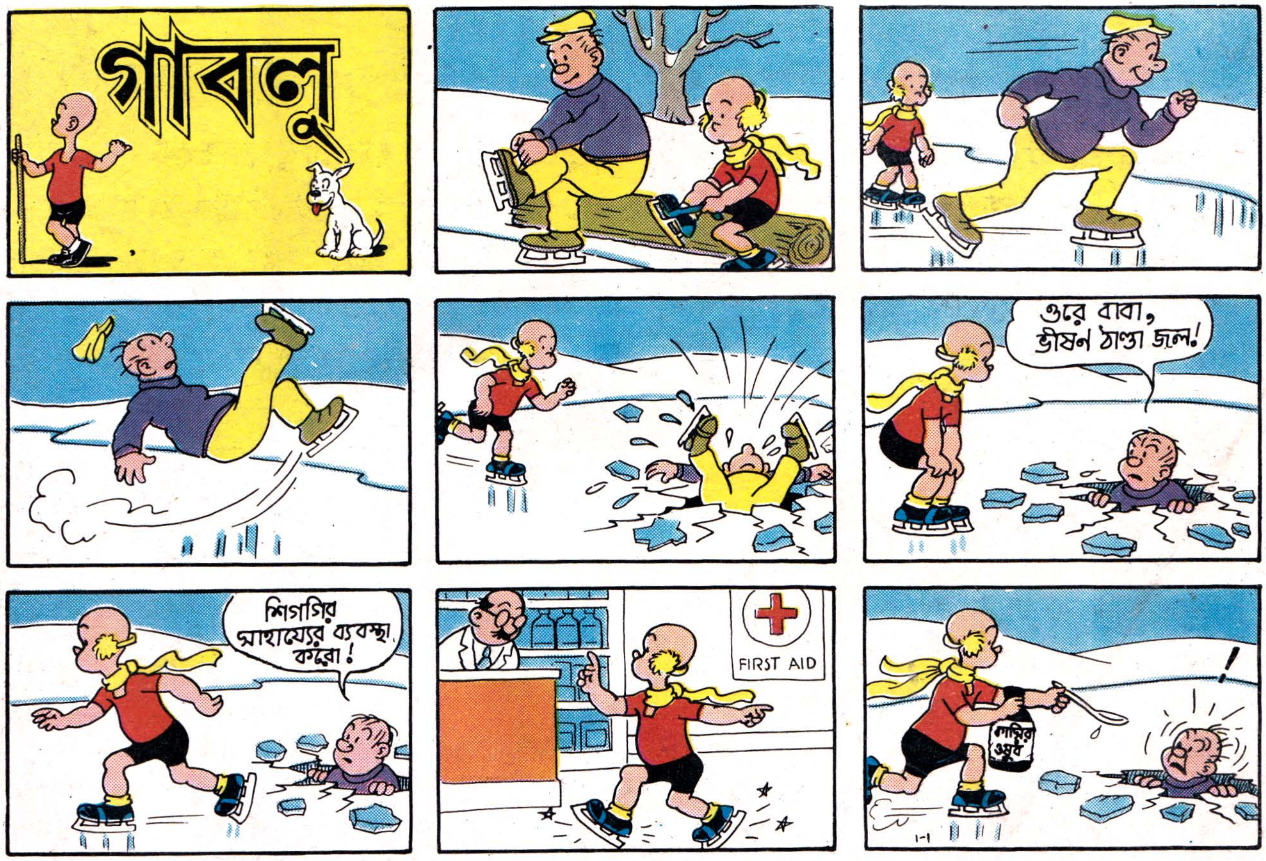
গাবলু
ওরে বাবা, ভীষন ঠান্ডা জল!
শিগগির সাহায্যের ব্যবস্থা করো!
FIRST AID
কাশির ওষুধ

বেনসন অ্যাণ্ড হেজেস কাপ মরীচিকা হয়ে রইল

সম্রাট রায়

সত্যি বলতে কী, খুবই নিরাশ হতে হয়েছে আমাদের। প্রাথমিক রাউন্ডের শেষ খেলায় ভারত যখন নিউজিল্যান্ডকে বধ করে ফাইনালে পৌঁছল, তখন কেন যেন মনে হয়েছিল বেনসন-হেজেস ওয়ার্ল্ড সিরিজ কাপটা ভারত পাচ্ছেই। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিনটি সম্ভাব্য ফাইনালের মধ্যে প্রথম দুটিতেই অভাবিতভাবে হেরে গেল ভারত সিডনি এবং মেলবোর্নে। ফলে তৃতীয় ফাইনাল খেলাটির আর দরকারই হল না।

কিন্তু কেন ভারত পারল না ? এর স্পষ্ট উত্তর হচ্ছে একদিনের ক্রিকেটে জিততে হলে যে লড়াকু মানসিকতা ক্রিকেটারদের থাকা চাই, আমাদের অনেকেরই তা ছিল না। সিডনিতে প্রথম ফাইনালে পৃথিবীর যাবতীয় সুযোগ ছিল ভারতের সামনে। টস জিতেছিল ভারত। অস্ট্রেলিয়াকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠানোর বাড়তি সুযোগ পেয়েও এবং মাত্র ১৭০ রানে তাদের ইনিংস আটকে রেখেও, ভারত জয় পেল না ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায়। ওয়ান-ডে ক্রিকেটে ভারতকে জেতানোর ক্ষমতা রাখেন যে ব্যাটসম্যানরা, সেই শ্রীকান্ত, আজহার এবং কপিলদেব, রানই পেলেন না। একা বেঙ্গসরকরের ৪৫ ভারতকে জয়ের দরজায় পৌঁছে দেবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। আর বাকিদের কথা না-বলাই ভাল। নিজেদের রানটুকু ছাড়া ভারতের জয়ের চেষ্টায় এঁরা কখনও কিছু করেছেন কি না ভেবে দেখার বিষয়। বোলাররা যে কাজটুকু করে দিয়েছিলেন, ব্যাটসম্যানদের অক্ষমতায় তা পূর্ণতা পেল না। ভারত হেরে গেল মাত্র ১১ রানে। সিডনিতে ধাক্কা খাবার পর মেলবোর্নে যুদ্ধ-জয় জরুরি ছিল। কিন্তু লাকি মাঠে ভারত শুরু করে অশুভভাবে। টসে হারলেন কপিল। এর আগে পর্যন্ত মেলবোর্নে যে দল পরে ব্যাট করেছে, জিতেছে তারাই। ভারতকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠানোয় প্রথম থেকেই একটা অশুভ ছায়া আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ভারতীয় ব্যাটসম্যানরাও দ্রুত রান তোলার চেষ্টায় অদ্ভুতভাবে বিলিয়ে দেন নিজেদের। চারজন রান আউট এবং মহিন্দর অমরনাথ গেলেন 'হ্যান্ডলিং দ্য বল'-এর অপরাধে। এর পরে কোনও দলের পক্ষে কি ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব ? বেঙ্গসরকরের ৪১ এবং শাস্ত্রীর ৪৯ রানের সহায়তায় ভারত কোনওক্রমে পৌঁছয় ১৮৭ রানে। এই রানে বিপক্ষকে আটকে রাখা অসম্ভব। সেই কারণে অন্তত প্রথম ১৫ ওভারে বিপক্ষকে প্রচণ্ড আক্রমণ করা এবং কিছু উইকেট দখল করাই ছিল ভারতের প্রথম কাজ। কিন্তু একমাত্র কপিলদেব ছাড়া (পরবর্তী পর্বে কিছুটা শাস্ত্রী) চারপাশে এমন একজন বোলারকেও পাওয়া গেল না, যিনি আক্রমণকে জোরালো করতে পারেন। মাত্র ৩ উইকেট খুইয়ে অস্ট্রেলিয়া টপকে গেল ভারতকে। অসাধারণ ব্যাট করলেন দলনায়ক অ্যালান বর্ডার। আমাদের ব্যাটসম্যানদের দেখিয়ে দিলেন দায়িত্ববোধের দ্বারা একটি জাতি ও দেশকে কীভাবে আগলাতে হয়। সত্যি বলতে কী, ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের সবকটি বিভাগেই অস্ট্রেলিয়ানরা ছিলেন যোগ্যতর। ভারতের পক্ষে একমাত্র সান্ত্বনা, বেনসন-হেজেস কাপে 'প্লেয়ার অব দ্য সিরিজ' এবং ব্যাটিংয়ে সেরা স্ট্রাইক রেট থাকায় দু-দুটি পুরস্কার একা লাভ করলেন কপিলদেব। ক'দিন আগে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজেও কপিলদেব পেয়েছিলেন 'ম্যান অব দ্য সিরিজ'-এর পুরস্কার (যুগ্মভাবে শ্রীকান্তর সঙ্গে)। ১৯৮১-৮২ সিরিজে অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড- ভারতের মধ্যে ত্রিদলীয় বেনসন-হেজেস কাপে সুনীল গাওস্করের নেতৃত্বে ভারত ফাইনালেই উঠতে পারেনি। এবার ফাইনালে পৌঁছেও কপিলদেবের ভারত শেষরক্ষা করতে পারল না।

অ্যালান বর্ডার (বিজয়ী অধিনায়ক)

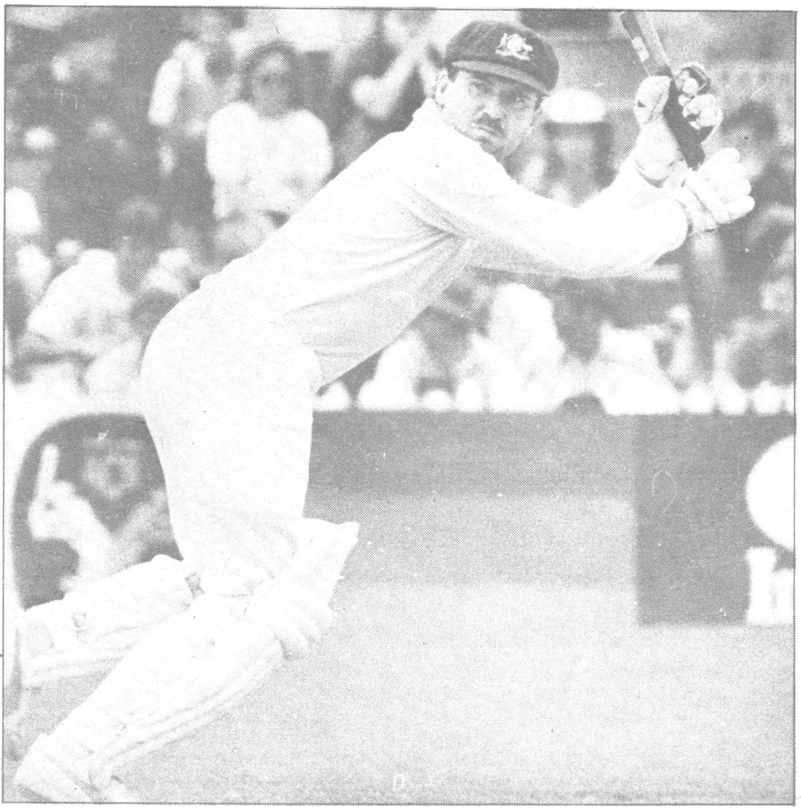

ক্রমেই ডুবছে বাংলার ক্রিকেট

রাজা গুপ্ত

সোজা পথে মাথা উঁচু করে নয়, বাংলা রঞ্জি ট্রফির নক আউট পর্যায়ে শেষ পর্যন্ত যাবার সৌভাগ্য অর্জন করল খিড়কির দরজা দিয়ে। বিহারের বিরুদ্ধে ১০ উইকেটে হেরে যাওয়ায় ওড়িশার মোট পয়েন্ট দাঁড়ায় ৭২। কোনওরকমে এক পয়েন্ট এগিয়ে থাকায় বাংলার ভাগ্যে অভাবিতভাবে জুটে গেল মূল পর্বে যাবার সুযোগ। নিজেদের যোগ্যতায় নয়, নক আউট পর্যায়ের দরজাটা বাংলা খোলা দেখল ওড়িশার ব্যর্থতায়। আবার বলছি, এইভাবে যাবার সুযোগ পাওয়ার মধ্যে গর্ব বোধ করার মতো কিচ্ছু নেই।

বাংলার ক্রিকেট নিয়ে সত্যিই এখন আর লেখার কিছু আছে কি? কিছুদিন আগেও বিহার, ওড়িশা, আসামের বিরুদ্ধে ক্রিকেট মাঠে দাপটে প্রভুত্ব করেছে বাংলা। এককালে এও দেখেছি, আগে ব্যাট করতে যাবার জন্য একসঙ্গে বাংলার একাধিক ক্রিকেটার বায়না জুড়েছেন ক্যাপ্টেনের কাছে। আগেভাগে ব্যাট করতে যাওয়া মানে বেশ কিছু রান তো বটেই, চাই কি সেঞ্চুরিটাও সেরে নেওয়া। এখন দিনকাল একদম পালটে গেছে। এখন বাংলার বিরুদ্ধে আগেভাগে ব্যাট করার জন্য বিহার, আসাম, ওড়িশার ব্যাটসম্যানরা বায়না ধরেন তাঁদের ক্যাপ্টেনের কাছে। কী আশ্চর্য অধঃপতন! গত বছর বাংলা পূর্বাঞ্চলের গণ্ডি টপকে রঞ্জি ট্রফির নক আউট পর্যায়ে যেতে পারেনি। এবারও পারত না। বিহারের কৃতিত্বে এবং ওড়িশার ব্যর্থতায় কোনওক্রমে মুখরক্ষা হল। ভাবতে অবাক লাগছে, পূর্বাঞ্চলের দলগুলো এমনিতেই সর্বভারতীয় মানের নিরিখে যথেষ্ট দুর্বল। বাংলার স্থান তাদের মধ্যেও শেষ সারিতে! হায় বাংলা!

ইডেনে ত্রিপুরা-বাংলা রঞ্জি ট্রফি ম্যাচ কভার করতে গিয়ে প্রথম দিনেই বুঝেছিলাম, রঞ্জিতে প্রথম খেলতে-আসা ত্রিপুরা কোনও দলই নয়। কলকাতার প্রথম ডিভিশনের যেকোনও ক্লাবই ত্রিপুরাকে চিত করে দিতে পারে। দাঁতে মারাত্মক বিষ নেই বলে হেলে সাপকে কেউ ভয় পায় না, ত্রিপুরার বোলিং আক্রমণে ঝাঁঝ না থাকায় বাংলার ব্যাটধারীরা ক্রিজে দাঁড়িয়ে নির্ভয়ে প্রভুত্ব করার সুযোগ পেয়ে যান। প্রণব রায় এবং অধিনায়ক অরুণ লাল রঞ্জিতে নিজস্ব সপ্তম এবং অষ্টম শতরানটি কুড়িয়ে নেন এত সহজে, যা ক্লাব ক্রিকেটেও লভ্য নয়। পালটা ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরা ১০১ রানে অল আউট হলেও এটা তখনই পরিষ্কার হয়ে যায়, বাংলার বোলিংয়েও ভেদশক্তি নেই। একমাত্র মিডিয়াম পেসার গৌতম সোম (ছোট) ছাড়া আর

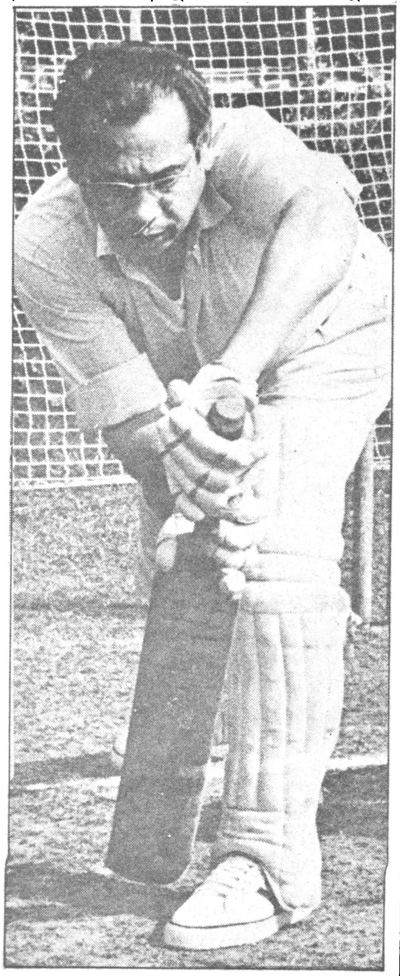

পঙ্কজ রায়

একটি টুথব্রাশ কিক'রে বিশেষ বলে গণ্য হয়?

বেশীর ভাগ লোকই ঐ বিষয়ে একেবারেই ভাবেন না–শুধু, যাঁরা ফরহ্যান্স ব্যবহার করেন তাঁরা ছাড়া!

সব টুথব্রাশই সমানভাবে তৈরী করা হয় না—

ফরহ্যান্স টুথব্রাশ অন্যগুলির চেয়ে সেরা।

এর ডবল অ্যাকশন, একাধারে দাঁতও সাফ করে আবার মাড়িও মালিশ করে।

আপনি আপনার টুথপেস্ট বেছে নেন, খুবই যত্নভরে তাই না? তাহলে আপনার টুথব্রাশও ফরহ্যান্স-ই হওয়া উচিত কিনা বলুন!

ফরহ্যান্স

ডবল অ্যাকশন টুথব্রাশ

অ্যাডাল্ট, জুনিয়ার ও অ্যাঙ্গুলার ডিজাইন

408-GM-241-BEN

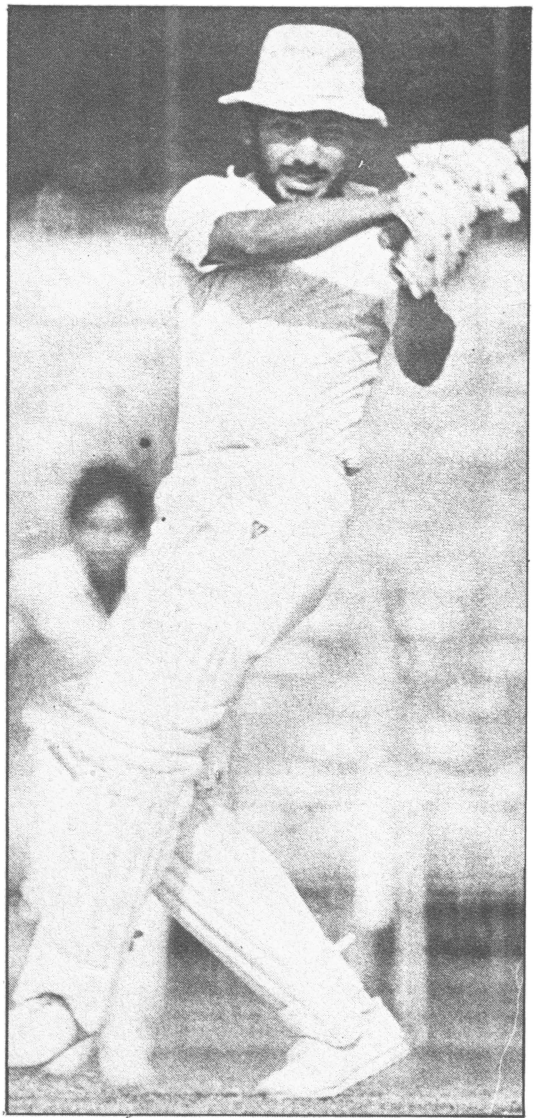

অরুণ লাল

কেউই বলের সঙ্গে ‘ব্রেনকে’ মেশাবার চেষ্টা করেন না ! অবাক লাগছিল দেখে, আমাদের বোলারদের কোনও উদ্দেশ্য নেই। যেন বল করতে হয় তাই বল করা। যদি দয়া করে ব্যাটসম্যান ভুল করেন সেই অপেক্ষাতে থাকা ! দুই স্পিনার সুজন মুখার্জি এবং অরূপ ভট্টাচার্যও ক্লাব ক্রিকেটে ‘টাইট’ বোলিং করার জন্য ফ্লাইট না করানোর যে অভ্যাসটি গড়ে নিয়েছেন, তার থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। অধিকাংশ নিষ্প্রাণ উইকেটে, যেখানে বড় স্পিন পাওয়া যায় না, সেখানে ফ্লাইটের হেরফের ঘটানোই যে আক্রমণের প্রধান অস্ত্র সেটা জেনেও তাঁরা তা ব্যবহারের কষ্ট স্বীকারে যাননি। ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ইনিংসে জিতলেও বাংলার বোলিংয়ের তীব্রতা যথাযথভাবে প্রমাণিত হয়নি।

পরের ম্যাচে আসামের বিরুদ্ধে বাংলা জেতে অপ্রত্যাশিতভাবে। আসাম প্রথম দফায় ৬ উইকেটে ৪০২ রান তুলে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে বাংলার বোলিংকে ছেলেখেলার পর্যায়ে নামিয়ে এনে। বাংলা ২৭৪ রানে ইনিংস শেষ করে। খুবই হালকাভাবে নিতে গিয়ে আসাম দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১২১ রানে অল আউট হয়ে যায়। প্রচণ্ড পিটিয়ে বাংলা জয় তুলে নেয়।

গোল বাধে পরের ম্যাচে ওড়িশার বিরুদ্ধে। বৃষ্টিবিঘ্নিত অমীমাংসিত ম্যাচে দু’ দলই পায় মাত্র ৩টি করে পয়েন্ট। সুতরাং বিহারের বিরুদ্ধে বাংলার ম্যাচটা হয়ে পড়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর এই ম্যাচেই বাংলার বোলাররা ফেল করলেন

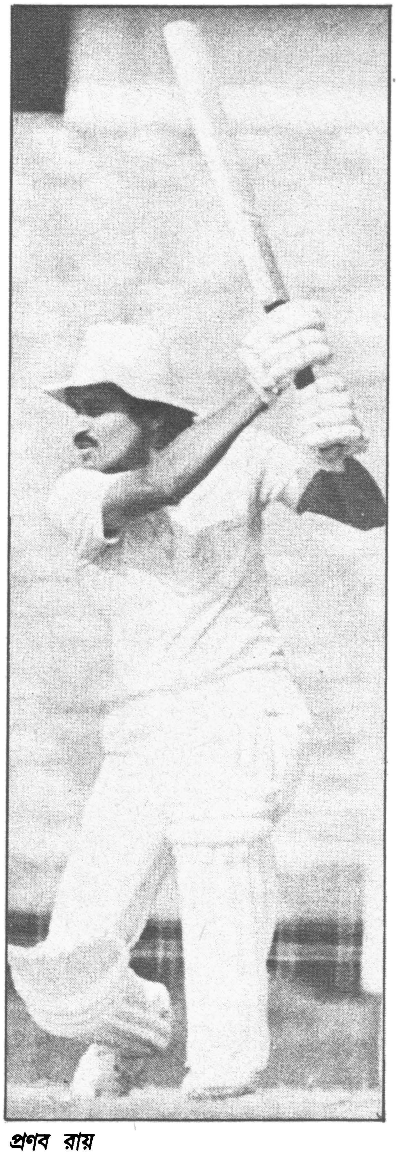

প্রণব রায়

নিদারুণভাবে। বিহার ৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার করে ৫৩২ রানে। জবাবে বাংলা করে ৩৯৩-৮। এরপর ঠিক আসামের মতোই বিহারও হালকাভাবে খেলতে গিয়ে ১৫৩ রানে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে। চেষ্টা করেও শেষ মুহূর্তে জয় পাওয়া সম্ভব ছিল না বাংলার। বাংলা লিগ শেষ করল মোট ৭৩ পয়েণ্টে।

অতঃপর শুরু হল বিহার-ওড়িশা ম্যাচের দিকে আমাদের তাকিয়ে থাকা। বিহারকে ধরার কোনও সুযোগই ছিল না। কারণ একটি ম্যাচ কম খেলেই তাদের পয়েন্ট ছিল বাংলার সমান। ওড়িশা একটি ম্যাচ কম খেলে পিছিয়ে ছিল ৯ পয়েণ্টে। বাংলার ভাগ্য ভাল, বিহারের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচ খেলে ওড়িশা ৭২ পয়েণ্টের বেশি সংগ্রহ করতে পারল না। গুলিটা বেরিয়ে গেল বাংলার কান ঘেঁষে।

কিন্তু তাতেই বা লাভ হল কী ? নক আউট পর্যায়ে বাংলা কোনওক্রমে পৌঁছল বটে, কিন্তু মহারাষ্ট্রের প্রথম ইনিংসের ৫৮৫ রানের উত্তরে বাংলার প্রথম ইনিংস ৩৭৩ রানে শেষ হয়ে গেল।

আনন্দমেলা

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর (১৯৫৬) ৮-ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হইল।

১। প্রকাশস্থান ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০ ০০১

২। প্রকাশকাল পাক্ষিক

৩। প্রকাশক ও মুদ্রাকর বিজিৎকুমার বসু, ভারতীয় নাগরিক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০ ০০১

৪। সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ভারতীয় নাগরিক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০ ০০১

৫। যে সকল ব্যক্তি এই সংবাদপত্রের মালিক এবং যাঁহারা মোট মূলধনের এক শতাংশের অধিক অংশীদার বা শেয়ার গ্রহীতা, তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা :

(ক) মালিক আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০ ০০১

(খ) মোট মূলধনের এক শতাংশেরও অধিক শেয়ার গ্রহীতা অলকা সরকার, অভীককুমার সরকার, অরূপকুমার সরকার, অধীপকুমার সরকার, অশনিকুমার সরকার, নাবালক পুত্র অরিত্রকুমার সরকারের পক্ষে অরূপকুমার সরকার, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০ ০০১

আমি বিজিৎকুমার বসু এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

বিজিৎ কুমার বসু

১ মার্চ ১৯৮৬ প্রকাশক

জেড্ডায় হেরে গেল ইস্টবেঙ্গল

নৃপতি চৌধুরী

পঞ্চম এশিয়ান ক্লাব চ্যাম্পিয়ানশিপের ফাইনাল রাউণ্ডের খেলায় যোগ দিতে সৌদি আরবের জেড্ডায় গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। ইউরোপিয়ান ক্লাব কাপ চ্যাম্পিয়ানশিপের মতোই টুর্নামেন্ট এটি। এশিয়ার দেশগুলোর সেরা ক্লাবকে নিয়েই এই প্রতিযোগিতা। কলম্বোতে প্রাথমিক রাউণ্ডের খেলায় ইস্টবেঙ্গল চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল নেপালের নিউ রোড ক্লাব, বাংলাদেশের আবাহনী ক্রীড়াচক্র, পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স, মালদ্বীপের ভ্যালেন্সিয়া ক্লাব এবং শ্রীলঙ্কার সণ্ডার্স ক্লাবকে হারিয়ে। ভারত থেকে প্রথম দল হিসেবে ফাইনাল রাউণ্ডে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল ইস্টবেঙ্গল।

জেড্ডায় হাজির থাকার কথা ছিল ৮টি ক্লাবের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুটি ক্লাব না আসায় ৬টি ক্লাবের মধ্যেই প্রতিযোগিতার আসর পাতা হয়। ইস্টবেঙ্গলের গ্রুপে ছিল সৌদি আরবের চ্যাম্পিয়ান আল-আহলি ক্লাব এবং ইন্দোনেশিয়ার টিগা বেলিয়ান। অন্য গ্রুপে ছিল সিরিয়ার আল ইত্তিহাদ, থাইল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কক ব্যাঙ্ক এবং দক্ষিণ কোরিয়ার দায়েয়ু রয়্যালস।

প্রথম ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল মুখোমুখি হয় আল-আহলির। ৩০ হাজার স্থানীয় দর্শকের চিৎকার বিপক্ষে থাকা সত্ত্বেও ইস্টবেঙ্গল শুরু করে দুর্দান্তভাবে। তিন নামী ফুটবলার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সুদীপ চ্যাটার্জি এবং বলাই মুখার্জি দলে না থাকায় ইস্টবেঙ্গল গোড়া থেকেই কিছুটা কমজোরি হয়ে পড়েছিল। কিন্তু রীতিমত দুর্বল দল নিয়েই তারা প্রথমার্ধে আল-আহলির বিপক্ষে প্রাধান্য বিস্তার করে খেলে। পাঁচ-ছ'টা নিশ্চিত গোলের সুযোগ পেয়েও কৃশানু, দেবাশিস রায় এবং জামশিদ কাজে লাগাতে পারেননি। যদিও ৩৩ মিনিটের মাথায় প্রথমে গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন দেবাশিস রায়। কিন্তু রাইট ব্যাক কবিরের একটি ছোট্ট ভুলে পাঁচ মিনিট পরে দূর থেকে শট নিয়ে গোল করেন খলিদ আবু। খেলা শেষ হবার দু' মিনিট আগে আল-আহলির অধিনায়ক আমিন দাবু জয়সূচক গোলটি করেন।

জেড্ডায় প্রথম দিকে ইস্টবেঙ্গলকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কিন্তু প্রথম ম্যাচের পর তারা বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় ম্যাচে ইন্দোনেশিয়ার টিগা বেলিয়ানের কাছে ইস্টবেঙ্গল ২—০ গোলে হেরে যায়। যদিও টিগা বেলিয়ান দলটি ছিল আল-আহলির চেয়ে দুর্বল। কিন্তু ৬৫ মিনিট তাদের আটকে রেখেও দু' গোল খেয়ে গেল ইস্টবেঙ্গল। প্রথম গোল বামবাং নুরদিয়ার, দ্বিতীয়টি মুনদারি কারিয়ার। দুটি খেলায় হেরে যাওয়ায় প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নেয় ইস্টবেঙ্গল। ওই গ্রুপে শীর্ষস্থান লাভ করে আল-আহলি, ১—০ গোলে টিগা বেলিয়ানকে হারিয়ে।

অন্য গ্রুপ থেকে চ্যাম্পিয়ান হয় দক্ষিণ কোরিয়ার দায়েয়ু রয়্যালস। দায়েয়ু এবং আল-আহলি এই দুই ক্লাবের ফাইনাল ঘিরে দর্শকদের মধ্যে ছিল প্রচণ্ড উৎসাহ। ২৫ হাজার দর্শকের উল্লাসের মধ্যে প্রথমে গোল করে এগিয়ে যায় স্থানীয় দল আল-আহলি। গোল করেন অধিনায়ক আমিন দাবু। দ্বিতীয়ার্ধের ২২ মিনিটে খেলায় সমতা ফেরান কোরীয় স্ট্রাইকার বাইউং জু বাইয়ুন। অতিরিক্ত সময়ে চমৎকার হেডে গোল করেন ইয়াং হা পার্ক। এর ৫ মিনিট পরেই আরেকটি গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন সিন উ কাং। ৩—১ গোলে জিতে এশিয়ার সর্বোত্তম ক্লাবের সম্মান লাভ করল দক্ষিণ কোরিয়ার দায়েয়ু রয়্যালস। প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান পায় টিগা বেলিয়ান।

কলকাতায় ফিরে আসার পর ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সুদীপ ও মনোরঞ্জন না থাকায় এবং ফরোয়ার্ডদের, বিশেষ করে জামশিদ ও দেবাশিস গণ্ডায় গণ্ডায় গোল মিস করায় ইস্টবেঙ্গল সাফল্য পায়নি।

আপনার টুথব্রাশ আপনি কি ক'রে বাছবেন?

বেশীর ভাগ লোকই ও বিষয়ে মোটেই চিন্তা করেন না— শুধু, যাঁরা ফরহ্যান্স ব্যবহার করেন তাঁরা ছাড়া!

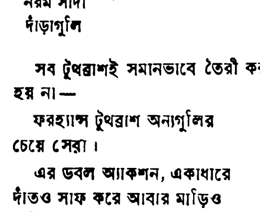

সব টুথব্রাশই সমানভাবে তৈরী করা হয় না— ফরহ্যান্স টুথব্রাশ অন্যগুলির চেয়ে সেরা। এর ডবল অ্যাকশন, একাধারে দাঁতও সাফ করে আবার মাড়িও মালিশ করে। আপনি আপনার টুথপেস্ট বেছে নেন খুবই যত্নভরে তাই না? তাহলে আপনার টুথব্রাশও ফরহ্যান্স-ই হওয়া উচিত কিনা বলুন!

ফরহ্যান্স

ডবল অ্যাকশন টুথব্রাশ

অ্যাডাল্ট, জুনিয়ার ও অ্যাঙ্গুলার ডিলাক্স

410-GM-241-BEN

নেহরু কাপ রাশিয়া পেল

অশোক রায়

পঞ্চম নেহরু গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট হয়ে গেল ত্রিবান্দ্রমে। এবারের টুর্নামেন্টে যোগ দিয়েছিল ভারতসহ মোট ছ'টি দেশ। বিদেশী দলগুলি হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন, চিন, দক্ষিণ কোরিয়া, পেরু, পূর্ব জার্মানি। রাউণ্ড রবিন লিগ প্রথায় প্রত্যেক দেশকেই মোট পাঁচটি করে মাচ খেলতে হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন পাঁচটি ম্যাচের চারটিতেই জেতে। চিনের বিরুদ্ধে খেলা শেষ করে গোলশূন্যভাবে। তারা মোট গোল করে তেরোটি এবং একমাত্র গোলটি খায় পূর্ব জার্মানির বিরুদ্ধে। উদ্বোধনী ম্যাচেই তারা যেভাবে ভারতকে নাস্তানাবুদ করে ছ'গোলে হারায় তা দেখে বোঝা গিয়েছিল রুশি দলটি কতখানি শক্তিশালী। রুশিরা ফাইনালে পৌঁছয় সহজেই।

অন্যদিক থেকে ফাইনালে ওঠে চিন। পাঁচটি ম্যাচের মধ্যে তিনটিতে জয় পায় তারা। গোলশূন্যভাবে খেলা শেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অবিশ্বাস্যভাবে ভারতের বিরুদ্ধে। দক্ষিণ কোরিয়া এবং পেরুর কাছে একটি করে গোল হজম করেও চিন মোট গোল দেয় ছ'টি।

গতবার কোচিনেও ফাইনালে গিয়েছিল সোভিয়েত দল এবং যুগোস্লাভিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়ে বিজয়ী হয়ে দেশে ফিরেছিল। অন্যদিকে চিন নেহরু কাপের পাঁচ বছরের ইতিহাসে '৮৫ সাল বাদে বাকি চারবারই ফাইনালে উঠেছে। এবং বিস্ময়করভাবে আগের তিনবারের মতো এবারেও তারা ফাইনালে জয় পেল না। কী যে হয় চিনাদের! সোভিয়েত দলের বিরুদ্ধে ফাইনালে অত্যন্ত সাধারণ মানের ফুটবল খেলে ১-০ গোলে হেরে যায়।

পরপর দু'বার নেহরু কাপে চ্যাম্পিয়ান হল সোভিয়েত ইউনিয়ন। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান পেল যথাক্রমে পূর্ব জার্মানি, পেরু এবং দক্ষিণ কোরিয়া।

কোচ প্রদীপ বড় বিষণ্ণ

এবার আসা যাক ভারতের কথায়। নানা কারণে ভারত এবার কিছু নামী ফুটবলারের সাহায্য পায়নি। পি কে ব্যানার্জির কোচিংয়ে বেশ কয়েকজন উঠতি ফুটবলারের সঙ্গে অভিজ্ঞ ফুটবলারদের মিলিয়ে মোটামুটিভাবে একটা টিম তৈরি করা হয়। কিন্তু মাঠে নামার পরে ভারতীয় ফুটবলারদের দেখে আঁতকে উঠতে হল। পাঁচটি ম্যাচে ১৪টি গোল খেল তারা। চিনের সঙ্গে একমাত্র গোলশূন্যভাবে খেলাটি ছাড়া পয়েন্ট পাওয়া দূরে থাকুক একটি গোলও দিতে পারেনি কোনও দলকে। এর মধ্যে সোভিয়েত এবং পূর্ব জার্মানির বিরুদ্ধে হার যথাক্রমে ছয় এবং পাঁচ গোলে। বলা বাহুল্য, এমন শোচনীয়ভাবে এবারের নেহরু কাপে আর কোনও দেশ পরাজিত হয়নি। শুধু এবারেই বা কেন, নেহরু কাপের ইতিহাসে এমন লজ্জাজনকভাবে ভারতও কি আগে হেরেছে?

ভাবতে অবাক লাগে, এই ফুটবল নিয়ে আমরা গর্ব করি, তর্ক জুড়ি, রোদ-জল-ঝড় উপেক্ষা করে মাঠে ছুটি! কোনওরকমে একটিমাত্র পয়েন্ট পেয়ে ভারত সর্বশেষ স্থান লাভ করেছে। গতবারেও তারা পেয়েছিল যথারীতি সর্বশেষ স্থানটি। অথচ পরীক্ষায় শেষ স্থান-পাওয়া ভারতের প্রতি আমাদের মমতা এবং অনুরাগের শেষ নেই। বছরের পর বছর একই শোচনীয় ফল হচ্ছে দেখেও আমরা আশা করি এবং স্বপ্ন দেখি ভারত নেহরু কাপে জিতবে! স্বপ্ন দেখার দিন কবে শেষ হবে কে জানে!

পূর্ব জার্মানির বিরুদ্ধে ভারতের খেলার একটি দৃশ্য। ব্রহ্মানন্দ বল ধরেছেন

ফোটো : সন্তোষ ঘোষ

সস্তা পাউডারগুলো ন্যাটের মত পরিস্কার তো করেই না, ভালো জামাকাপড় নষ্ট করে

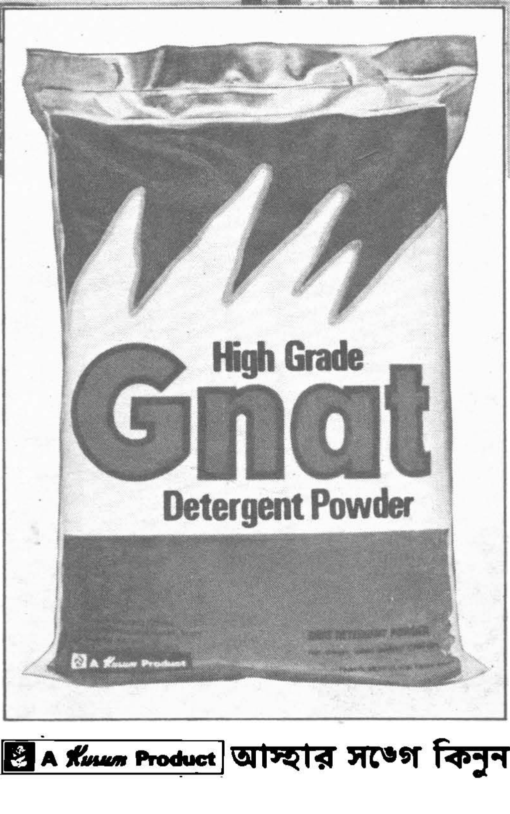

ন্যাটের অনেক গুণ। তাই তো সুগৃহিণীর কাছে তার এত কদর। বিশেষ জার্মান পদ্ধতিতে তৈরি ন্যাট ডিটার্জেন্ট পাউডারের দানাগুলি হাল্কা অথচ ময়লা ধোওয়ার শক্তিতে ভরপুর। সেইজন্য ওজন অনুপাতে অনেক বেশি পাউডার আপনি পান। তাছাড়া সাধারণ পাউডারে যতটা সোডা-অ্যাশ থাকে ন্যাটে থাকে তার চেয়ে অনেক কম। ফলে জামাকাপড় নষ্ট হয় না কাপড়কাচা হাতও যত্নে থাকে। সাধে কি বলি–

এতটুকু ন্যাটের ছোঁয়ায় জামাকাপড়ের রূপ খুলে যায়।

ন্যাট ৪০ গ্রাম, ২০০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম, ১ কেজি ও ২ কেজি প্যাকেটে পাওয়া যায়।

A Kusum Product আস্থার সঙ্গে কিনুন

GK&E.C85.43

Anandamela 5 March 1986. Regd. No. WB/CC/264. MH By-South 683TN/MS(c)/734